আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বাষষ্টিতম গ্রন্থ

সুরের হাওয়া

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্-সি

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

জীবন সন্ধ্যায় ও যিনি 'সৎপ্রসঙ্গ' ও 'সদ্‌গুরু-কথামৃত'
নামে দু'খানা উপাদেয় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্য
প্রীতিব পরিচয় দিয়াছেন, মনোরম শিক্ষা এবং
উপদেশ দ্বারা যিনি আমাকে সাহিত্য-
চর্চ্চায় উৎসাহিত করিয়াছেন,
আমাব সেই পরমারাধ্যা
মাতৃদেবীব
শ্রীচরণে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'সুরের হাওয়া'র প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষ হইয়াছে ; কিন্তু সময়াভাবে এবং নানা প্রতিকূল কারণে এতদিন ইহার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয় নাই।

এইবার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় ইহা পাঠক সমাজে আদৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

দক্ষিণ গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।
মাঘ, ১৩৩৭।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

সুরের হাওয়া

১

বাদল রাতের ঝড়ো-হাওয়া বাইরে খুব মাতামাতি সুরু করিয়াছিল। অন্ধকারের গুমট ভেদ-করা বিদ্যুচ্চমকের সাথে গুরু গুরু দেয়ার ডাক বাইরের অবিরাম ঝিল্লিরব ডুবাইয়া অনন্তের এক গম্ভীর বার্ত্তা প্রচার করিতেছিল। পরীক্ষার কঠোর অধ্যয়ন-ক্লিষ্ট সৃষ্টিনাথের চোখের পাতায় তন্দ্রা সবেমাত্র তার বিরামদায়িনী কোমল হাতখানি বুলাইয়াছিল, এমন সময় বাইরের দমকা হাওয়ায় জানালা খুলিয়া বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগায় নিদ্রোত্থিত সৃষ্টিনাথ জানালা ভেজাইতে যাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। পাশের বাড়ীর অস্পষ্ট সঙ্গীতরেশ প্রলয় বিষাণের মাঝেই তাহার কানে কি সে সুরের হাওয়া বহিয়া আনিল যাহা তাহার স্মৃতি ও শ্রুতির ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ অভিনব! বৃষ্টির ছাটে আধভেজা হইয়াই সৃষ্টিনাথ সেই আধশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি নিঝুম শ্রাবণরাতে শ্রবণ ভরিয়া শুনিল—

"তুমি কেমন করে গান কর রে গুণি
আমি অবাক্ হয়ে শুনি"—

গুণীর গানই বটে এই প্রলয়-বিষাণ এবং অবাক্ হইয়া শুনিবার ও স্তুতি করিবার মতো বটে! উত্তুঙ্গ শৈল ও অতল জলধি যাঁর সৃষ্টি, গানও তাঁহার এমনি উদ্দাম তাণ্ডব তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু মর্ম্মের নিভৃততম স্থানে পশিতেছিল সেই স্বরগ্রাম। স্বর বটে,—সাধনার ফল, শুনিবার মত। কিন্তু কৈ সঙ্গীতের রেশ ত কখনো তার প্রাণে মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরং 'ও সুধায় বঞ্চিত' বলিয়া বন্ধুমহলে তাহার অখ্যাতি ছিল যথেষ্ট।—"Song charms the sense" কবির এই উক্তি কখনো সে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই, তবে আজ প্রকৃতির এই তাণ্ডবলীলার মাঝ থেকে তাহার প্রাণে এ কি সুমধুর স্পর্শ!...

গীত বন্ধ হইল, কিন্তু রেশটুকু বহুক্ষণ তাহার কানের কাছে ঘুরিয়া ফিরিল। অবশেষে যখন তাহার আবেশ বিভোর ভাবটুকু কাটিল, বাইরের ঝড় থামিয়া তখন কালো আকাশের বুকে হাজার তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, মুক্তির আরামে দু'চারিটা পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল না, বুঝিবা সে কথা তাহার মনেও ছিল না। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সৃষ্টিনাথ বিছানায় যাইয়া শুইল এবং ভাবিতে লাগিল, তাহার এই প্রথম অনুভূতির কথা। কি এ সুরের হাওয়া! অন্তরের এক পুলক-স্পন্দন না অন্তরের এক গোপন-ইঙ্গিত? যে প্রচ্ছন্ন ভাব মানুষের মর্ম্মের মাঝে অজ্ঞাতে লালিত হয় এ কি তাহারি স্বতঃ-বিকাশ না আর কিছু? কেন একটি সুরের

তাড়নায় প্রাণে এমনি লহর-লীলা, কেন চিরসুপ্ত ভাবনার নব জাগরণ ?···

রাত্রিশেষে যতটুকু তন্দ্রাবেশ হইল, সৃষ্টি খালি সুরের স্বপ্ন দেখিল,—যেন জগৎ কিছু নয়, খালি একটি অনাহত সুরের রাজ্য। সেই অনাদি যুগ হইতে খালি সেই সুরের হাওয়া নিখিল ভুবনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যতদিন সেই স্পন্দন প্রাণের গোপন-পর্দ্দা স্পর্শ না করে ততদিনই তন্দ্রা, সুরের স্পর্শ জাগরণ !···

প্রভাতের প্রথম আলোর ছোঁয়ায় চোখ মেলিয়া সৃষ্টি দেখিল, মুক্ত জানালা দিয়া কচি কচি রাঙ্গা হাতগুলি তাহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে,—বক্ষে, স্কন্ধে, চিবুকে সারা অঙ্গে ভোরের সমীরণের কি সে সোহাগ চুম্বন! অবাক্ হইয়া সে আকাশটুকুর পানে তাকাইল,—অসীম নীলের দেশে শুভ্র মেঘ-মালার কি সে জড়াজড়ি, আস্ফালন, নৃত্য-ভঙ্গিমা! ছাদের আলিসায় চোখ ফিরাইল,—কপোত-কপোতীর ভাষাহীন আলাপনে নিখিলের সমস্ত কাব্য উথলিয়া উঠিতেছে !···

সৃষ্টিনাথ সত্য সত্যই অবাক্ হইল। কোন্ যাদুকর তাহার চারিপাশে এমনি রূপ-রস-গন্ধ ছন্দ ভরা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিল ?—

কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি তার কলিকাতার মেসের ও কলেজের দৈনন্দিন একঘেয়ে কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়া শ্লথ-মন্থর গতিতে কাটিয়াছে। পুথির বাইরে যে একটা সবুজ জগৎ আছে, বসন্তসমাগমে তাহা রূপ-রস গন্ধে ছন্দে মাতাল হইয়া উঠে এ কথা

ত এতদিন তাহার কাছে গোপন রহিয়া গিয়াছে,—সে জানে নাই, ভাবে নাই, অনুভব করে নাই,—সে সুযোগ ও অবসর ও পায় নাই। অধ্যয়ন এবং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভই ছিল তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য,—তাই ভোরের আলো পৃথিবীতে কেমন মাধুরীতে ফোটে, আবার কি অপরূপ গৌরবে নিভিয়া যায় সে ফিরিয়া চাহে নাই। আজ চাহিয়া সে আর চোখ ফিবাইতে পারিল না,—জগতের এত রূপ আর সে রূপ উপভোগে এমন অসহ পুলক!...

২

আলোক ও কিরণের ডাকে ভাবের সমাধি হইতে জাগিয়া ধড়মড় করিযা উঠিয়া সৃষ্টিনাথ যখন দবজা খুলিল তখন ভোবের অরুণিমা কাটিয়া রজতাভায় পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। পাশেব বাড়ীর বৃষ্টি ধোয়া ফুলেব স্নিগ্ধ গন্ধ বহিয়া মাতাল বাতাস বহিয়া রহিয়া টলিয়া টলিয়া আসিতেছিল। নাচেব বাজপথ বিবিধ যান ও পথিকের চলাচলে শব্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

আলোক বলিল, "বোদে বাড়ীঘব ভ'রে গেছে। সাবারাত পড়্ছিলে বুঝি?" সৃষ্টিনাথ অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। কিবণ বলিল, "বড্ড বেশী রাত জাগ্‌ছ, পরীক্ষার কাছাকাছি অসুখ হয়ে পড়বে। তোমার জায়গা নেয় কে হে?"

আলোক বলিল, "রেকর্ড মার্কের লোভটা যদিও কম নয় তবু শরীর বাঁচিয়ে চলা দরকার।"

সৃষ্টিনাথের ঘরে ঢুকিয়া প্রায় চমকিয়া উঠিয়া কিরণ বলিল,

"ঈস্, বিছানা পত্তর সব যে ভিজে গেছে, ঘরে জল একেবারে থৈ থৈ! বই ফেলে জানালা ভেজাবার সময়টুকুও পাও নি। অদ্ভুত মানুষ তুমি! কি ঝড় গেছে কাল, সারা রাত তোমার জানালা খোলা ছিল!"

সৃষ্টিনাথ হাসিল। আলোক বলিল, "কাল্‌কের রাতটা উপভোগ কর্ব্বার ছিল কবির আর প্রণয়ীর। দুএর একটিও তুমি হতে যদি তারিফ কর্ত্তেম; কিন্তু বলিহারি তোমাকে,—কি যে ছন্দই আছে তোমার পুথির পাতে।" বলিয়াই খাটের অপর পাশে নীচে দৃষ্টি পড়ায় সে অবাক্ হইয়া বলিল, "ওকি তোমার বইখানা যে খাটের তলায় ছিট্‌কে আছে! যাঃ বাতিটাও পড়ে চিম্‌নিটা চুরমার! ব্যাপারখানা কি হে?" বলিয়া সন্দিগ্ধ চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কিরণ ঐ পাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইখানি কুড়াইতে কুড়াইতে কহিল, "সত্যি ত, এ যে তোমার Dowden খানা। বেচারার সঙ্গে কাল রাতে মানাভিমানের পালা গেছে না কি হে? কি হয়েছিল তোমার কাল?"

কি জানি কেন কল্যকার সুরের অভিসারের কথা কহিতে সত্যবাদী সৃষ্টিনাথের সৃষ্টিছাড়া সঙ্কোচ বোধ হইল; কিন্তু নাছোড়বান্দা বন্ধুদের জেরায় সত্যটা বাহির হইয়া পড়িল। বন্ধু দু'টি কিছুক্ষণ টিট্‌কারির ধমকে তাহাকে উদ্বাস্ত করিল, এবং সঙ্গীত-কারিণী সায়রেণদের পুরাতন গল্পটার আবৃত্তি করিয়া রঙ্গচ্ছলে তাহার পরিণামটিও সম্‌ঝাইয়া দিল। অধিকন্তু সঙ্গীতবিমুখ সৃষ্টিনাথের তন্ময়তার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া সেই মামুলী

উপমাটিই কহিল, "যে মদের দেশের লোকের চেয়ে যে দেশে মদের দুর্ভিক্ষ সেখানকার লোক বেশী মাতাল, এবং গতরাত্রির ঝড়ো হাওয়া ও গুরু বর্ষণের হাত হইতে তাদের রক্ষা পাবার কারণ তাদের সঙ্গীতসিদ্ধ অবস্থা। আজ বন্ধুদের তর্কের মাঝে সৃষ্টিনাথকে মানিয়া লইতে হইল যে, সঙ্গীত ইন্দ্রিয় সম্মোহক, বরং আরো উঁচু পর্দ্দায় উঠিয়া সে কহিল, "মানুষ মাত্রেরই হৃদয় একটি প্রকাণ্ড সুরযন্ত্র, উপযুক্ত ছড়ের আঘাত পড়িলে তবেই তাতে সুর জেগে ওঠে, যতদিন না সেই ঘা পড়ে ততদিন হৃদয় নীরব থেকে যায়।" সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের কথাটাও কহিয়া গেল।

আলোক খুসী হইয়া কহিল, "খাঁটি কবির কথা। আমিও এদ্দিন ভাব্‌তাম এ হতেই পারে না। সাহিত্যের সুধা নিংড়ে যে আকণ্ঠ পূরে পান করে, সঙ্গীতের রেশ তার কানে পৌঁছে না এও কি সম্ভব?"

কিরণ ততোধিক উৎফুল্ল হইল, কারণ সৃষ্টিনাথের প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে সে কিছুতেই নূতন কেনা হার্ম্মোনিয়ামটিতে তাহার বাজখাই গলা যখন তখন সাধিতে পারে না,—এই মেধাবী যুবকটিকে মেসের সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত। সে বলিল, "এদ্দিন ত দাদা আমি হার্ম্মোনিয়ম নিয়ে বস্‌তেই আমার ওপর খাপ্পা হয়ে উঠ্‌তে। ও সুধার স্বাদ একবার যে পেয়েছে সে কি কখনো নীরব থাক্‌তে পারে?…দুঃখু বল, বিরহ বল সঙ্গীতে সব ভোলা যায়। সীতাদেবী হার্ম্মোনিয়াম বাজাতে জান্তেন কিনা

জানি না, কিন্তু অশোকবনে হার্ম্মোনিয়াম পেলে অমন দুঃখেও মনটা একটু হাল্কা হত আমি দিব্বি কেটে বল্‌তে পারি।”

সৃষ্টিনাথ ও আলোক হাসিয়া উঠিল। কিরণ অধিকতর উৎসাহিত হইয়া বলিল, “নিজের অনুভূতি না হলে এ সবের মর্ম্ম বোঝা যায় না। আজ তোমার মর্ম্মে সুরের সাড়া পড়েছে তাই লক্ষ্মীছেলেটির মত এ চর্চ্চা কান পেতে শুন্‌চ। যদি এ উচ্চ অঙ্গের কলা না হবে তা হলে আকবর বাদসা তানসেনের অত আদর কর্ত্তেন না, আর সুরের আলোয় আগুন জ্বলার প্রবাদ শোনা যেত না।”

কাল যার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলে তিনি টি, রায়ের মেয়ে বংশানুক্রমে ওরা সুগায়ক, ওস্তাদের কাছে গান শেখে, গভীর রাতে স্বর সাধে, মিষ্টি ত লাগ্‌বেই। আর আমার—হ্যাঁ সেদিন ত হার্ম্মোনিয়াম কিনেছি, ওস্তাদ টোস্তাদের কাছেও ভিড়ি না, নিজে নিজে যেটুকু হচ্ছে। তবে কিছু দিন পরে দেখ্‌বে নিতান্ত পাত্‌ফেলা নই।”

সৃষ্টিনাথ তাহাকে উৎসাহিত করিয়া কহিল, “বেশ, বেশ, আজ বিকেলে তোমার গান শুন্‌ব।”

বেলা বাড়িতেছিল, আলোক ও কিরণ নিজের ঘরে চলিয়া গেল। গায়িকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তাহারও করিল না, পরনারীচর্চ্চাবিরোধী সৃষ্টিনাথও জিজ্ঞাসা করিল না, যদিও আজ গায়ে পড়িয়া তাহারা এ আলোচনা করিলে অন্যদিনের মত সৃষ্টি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিত না।

দিনটা কলেজ ও পাঠের ভিতর কাটিয়া গেল; কিন্তু রাত্রিতে কি জানি কেন, একেলা ঘরে সৃষ্টিনাথ কেমন একটু চাঞ্চল্য বোধ করিতে লাগিল, কারণটা সে যেন নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পাঠে অন্যান্য দিনের তন্ময়তার অভাব সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল, এবং উচ্ছৃঙ্খল মনটাকে পুথির পাতার প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখিবার জন্য সন্ধ্যা হইতেই সে ওদিককার জানালাটার সার্সি টানিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তবুও পাঠে তেমন অগ্রসর হইতে পারিল না। শেক্‌স্‌পিয়ার, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টল্‌ষ্টয়, মেটারলিঙ্ক সমস্তই আজ তাহার নিকট নীরস বোধ হইল।

অবশেষে নিঝুম রাতে যখন দুরাগত রাগিণীটি তাহার নিখিল ভুবনে উন্মাদনা ছড়াইয়া দিল সৃষ্টি তখন নিজের অজ্ঞাতে জানালাটি খুলিয়া তাহার পাশে উপাসকের মত ভক্তিসম্ভ্রমে আসিয়া দাঁড়াইল।—কি সে দেবদুর্ল্লভ কণ্ঠ, মর্ম্মের হারানো স্মৃতি জাগানো স্বরলহরী,—জগতের আর কিছু বুঝি এমন পুলক-স্পন্দন জাগাইতে পারে না!…

এম্নি করিয়াই ধীরে ধীরে তাহার চিত্ত আবেশ-বিভোর হইয়া উঠিতেছিল। নেশার প্রথম—বিহ্বলতায় স্খলিত ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ববশে রাখিবার ব্যর্থ প্রয়াসের মত সৃষ্টি আপনার সহিত যুঝিল; কিন্তু প্রাণ যদি সুরের দেশের সন্ধান পায় কেউ কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

অবশেষে যখন একদিন প্রভাতে সৃষ্টি শুনিল ও বাড়ীর টি, রায় বাড়ী বদ্‌লাইতেছেন তখন কি জানি কেন, তাহার বুক গুরুভারে

পীড়িত হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম মিথ্যা ভাণ করিয়া সৃষ্টি কলেজ কামাই করিল এবং তাহার ত্রিতলের এই নির্জ্জন কক্ষটির জানালার পাখি তুলিয়া পরের অন্তঃপুরে এই প্রথম লুকাইয়া চাহিল। গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া রাশি রাশি বাক্স, বিছানা, চেয়ার, টেবিল চাকরে নূতন বাটিতে লইয়া যাইতেছিল। সৃষ্টির পিপাসু নয়ন ছু'টি ও বাড়ীতে ঘুরিয়া আসিল। গাড়ীবারান্দার নীচে মোটরের ভস্ ভস্ শব্দ শোনা যাইতেছিল। কতকগুলি লতা এদিকটায় এমন নিবিড় কুঞ্জে পরিণত যে তাহা সৃষ্টির চোখে একটা দুর্ভেদ্য কারাপ্রাচীর সৃষ্টি করিল। ইপ্সিত বস্তুটি সৃষ্টির চোখের আড়াল হইয়াই রহিল, খালি মোটর গেট পার হইয়া যখন মোড় ফিরিল সৃষ্টি দেখিল মোটরের হাতল ধরিয়া একটি শুভ্র নিটোল হাত! পর নারীর প্রতি তাহার এই প্রথম চোরা চাহনি। কি জানি কেন সে খানিকক্ষণ আনমনে বাহিরেব দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর যেমন অনেক অপরিপূর্ণ রঙ্গিন ছবি মানুষের বুকে জলবুদ্‌বুদের মতই মিলাইয়া যায়, সৃষ্টির বুকের মাঝেও তেম্নি সেই আবেশ-বিভোর ভাবটুকু বিলীন হইল। কিন্তু যেদিন সিনেটে ফল জানিতে যাইয়া ছাপার হরপে সে তাহার নাম আশাতীত নিম্নে দেখিল সেদিন একটা লজ্জাকর অনুশোচনায় সে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ব্যর্থ প্রণয়ীর শোচনীয় পরিণামের কথা অনেকেই শুনিয়াছে, কিন্তু অচিন গায়িকার সুরের গমকে এমন বিফলতার কালিমায় কলঙ্কিত হইতে কেউ কথনো শোনে নাই। যার সুরে সে এম্নি মুগ্ধ হইয়াছিল সেই রক্তে মাংসে গড়া তরুণীটির সান্নিধ্যে

আসিলে সে যে কতখানি আত্মহারা হইয়া পড়িত তাহা কল্পনায় ভাবিয়া সৃষ্টিনাথ লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। অপরেশ, অপ্রতুল যাহারা কোনও পরীক্ষায় তাহার চেয়ে বেশী নম্বর কখনো পায় নাই, তাহারা হইল ফাষ্ট ক্লাস প্রথম ও দ্বিতীয়, আর সে হইল কিনা তৃতীয়! কি লজ্জাকর অবনতি!...

কিরণ ও আলোক সৃষ্টিনাথের খোঁজে আসিয়া তাহাকে এই কোণে আবিষ্কার করিয়া তাহার ঘাড়ে প্রায় লাফাইয়া পড়িয়া কহিল, "সন্দেশ খাওয়াবার ভয়ে এক কোণে চুপ্‌টি মেরে বসে আছ দাদা। সে হচ্ছে না, চল রেষ্টুরেণ্টে।"

উহারাও এম-এ দিয়াছিল অর্থ বিজ্ঞানে এবং সৃষ্টির মত ফল জানিবার জন্য কলিকাতায় অপেক্ষা করিতেছিল।

বিষণ্ণ মুখটি না তুলিয়াই সৃষ্টি কহিল, "ফল দেখেচ ত? এমনটা হবে ভাবিনি। অপবেশ, অপ্রতুলও আমায় ডিঙ্গিয়ে গেছে।"

কিরণ ও আলোক থার্ড ক্লাস পাস করিয়াও আহ্লাদে ডগমগ হইয়াছিল, কারণ ইতিপূর্ব্বে কোনও পরীক্ষা একেবারে পাস করা তাহাদের বরাতে ঘটিয়া উঠে নাই; কাজেই ফাষ্ট ক্লাস পাস এই সৃষ্টিনাথের জন্য সমবেদনা প্রকাশের যথেষ্ট হেতু তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। কিরণ কহিল, "আবে পরীক্ষার কথা রেখে দাও, ও এক লটারি। আমাদের কি মেধা নেই? কিন্তু হয়ে গেছি থার্ড ক্লাস। রয়েই গেছে।" আলোকও মৃদুভাবে মাথা নাড়িল।

সৃষ্টিনাথ রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "কোথায় ভেবেছিলুম শেষ পরীক্ষাটায় ফাষ্ট হলে একটা প্রফেসরি জুটবে, দেখ্‌চি—"

বাধা দিয়া আলোক কহিল, "সে জন্য ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন? ইংরাজিতে ফাষ্ট ক্লাস সোজা নয়, এ বছর ত্রই না হয় তিনজন হয়েচে। তারপর বি-এ অনার্সে তুমি ফাষ্ট। এবারকার ফলটা তোমার আকস্মিক। যাক্ গতস্য শোচনা, নাস্তি। চল, আজ একবার থিয়েটারে যাওয়া যাক্। কি প্লে আজ কিরণ?"

"ষ্টারে বিষবৃক্ষ, মিনার্ভায় বঙ্গনারী। দেখ্‌তে হচ্ছে কোথায় কে নাববে," বলিয়া কিরণ পকেট হইতে থিয়েটারের রঙ্গিন বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া অভিনেতাদের নাম পড়িল। শুনিয়া আলোক বলিল, "ষ্টারে চল, ওদের আজ ফুলপাটি নাব্‌বে। কুন্দ-নন্দিনী আর গোবিন্দলালেব পার্ট হবে সুন্দর।"

কিবণ হাসিয়া বলিল, "দূব গাধা, বিষবৃক্ষে আবার গোবিন্দলাল কেবে? য়ুনিভার্সিটি থেকে বেরুতে না বেরুতে বঙ্কিমবাবুকে শুদ্ধ ভুলে মেরে দিয়েছিস্।"

আলোক জিভ কাম্‌ড়াইয়া বলিল, "ওহো গোবিন্দলাল ত ইন্দিরায়, ঐ কাণা ফুলওয়ালীকে"—

কিরণ বাধা দিয়া বলিল, "যাক্ আর বাঙ্গ্‌লা সাহিত্যে তোমার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। তুমিও চল হে স্বষ্টি, কল্‌কাতায় এসে অবধি ত ওদিক মাড়াওনি বুঝি, একবার রঙ্গালয়ে পদধূলিটা দিয়ে যাও। পৃথিবীতে কাকেও ঘৃণা কর্ত্তে নেই হে, জান ত সর্ব্বঘটে নারায়ণ আছেন।"

আলোক বলিল, "ঠিক কথা। চল না হে, একটিবার গেলে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। এখন ত পাঠ্যজীবন নেই

যে থিয়েটারে গেলে কারু চোখ টাটাবে। হ্যাঁ আমি তোমার সাথে একমত হতে পারি না যে থিয়েটারে গেলেই গোল্লায় যাবার সদর দরজা খুলে যায়। অতটুকু মনের বল নেই যার, তার অধঃপাতে যাবার ফিকির ধর্ম্মমন্দিরেও হতে পারে। সঙ্কীর্ণ মতগুলো এখন ঝেড়ে ফেল্‌তে হয়, হোম্‌বা চোম্‌রা হয়েছি এখন ক্যালক্যাটা য়ুনিভার্সিটির এম-এ, খেলা নয়।,"—বলিয়া কামান গোঁফ মুচ্‌ড়াইবা'র অভিনয় কবিল।

কিরণ মাথাটি মৃদুভাবে দোলাইতে লাগিল। বোঝা গেল, কিবণেব সহিত সে একমত। সৃষ্টিনাথ গম্ভীরভাবেই কহিল, "থিয়েটারে গেলে গোল্লায় যায়, না গেলেই ভাল থ।কে, অমন কথা আমি কখনো বলি না। তবে পিছল পথে চল্‌লে যে আছাড় খাবাব সম্ভাবনা বেশী সে কথাটা মানি, যদিও এমন লোক দেখা গেছে যারা পিছল পথে চলেও আছাড় খায় নি।"

আলোক উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "দিব্বি উপমাটি দিয়েছ। কিন্তু পৃথিবীর সব ঠাঁই পিছল পথ আছে, তাতে জীবনে কোন না কোন দিন চল্‌তে হবে। নিজেকে তাতে অভ্যস্ত করে না নিলে হয়ত কোনও দিন এমন আছাড় খেতে হবে যার তাল সারাজীবনে সাম্‌লান দায় হবে।"

তর্ক করিয়া ফল নাই, সম্প্রতি মনের অবস্থাও তর্কের উপযুক্ত ছিল না। সৃষ্টিনাথ বলিল, "এ সব আলোচনা আর একদিন হবে ভাই, আজ ভাল লাগ্‌ছে না।"

"খাওয়াটা তাহলে আজ আদায় কর্ব্বার আশা নেই", বলিয়া ঔদরিক আলোকনাথ একটু দমিয়া পড়িল।

"বেশ ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যান্‌কে আজ থার্ড ক্লাস ম্যান্‌ই খাওয়াব, তোয়াজ করা ভাল" বলিয়া কিরণ সৃষ্টিনাথকে একপ্রকার টানিয়া হ্যারিসন রোডের রেষ্টুরেণ্টে লইয়া গেল। আলোক মহোল্লাসে তাহাদের অনুসরণ করিল, যাইতে যাইতে সুর করিয়া কহিল, "লুচিং শরণং গচ্ছামি, চপং শরণং গচ্ছামি, কাট্‌লেটং শরণং গচ্ছামি।"

বৈচিত্র্যময় কলিকাতার একটা গুণ এই যে ইহা বড় চিত্ত-বিক্ষোভকারী। বন্ধুদের সহিত কিছুক্ষণ আলোকমালা-শোভিত রাজপথে ঘুরিয়া সৃষ্টিনাথ যখন মেসে ফিরিল মন তাহার অনেকটা হাল্কা হইয়াছে। মেসের বারান্দায় টিনের বাক্সটিতে সৃষ্টি একখানি খাম পাইয়া প্রায়ান্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শিরোনামায় দৃষ্টি বুলাইয়াই বুঝিল কাহার পত্র, এবং অবিলম্বে তাহা পকেটে পূরিয়া ফেলিল। কিরণ ও আলোক ততক্ষণ দোতালায় উঠিয়া মহা হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছে। সৃষ্টি দোতালায় উঠিতেই চারিদিক্ হইতে ছেলেদের অভিনন্দন একপশলা বৃষ্টির মত তাহার উপর বর্ষিত হইল। আলোক ততক্ষণ হার্ম্মোনিয়ামটি খুলিয়া সিংহবিক্রমে "কতকাল পরে বল ভারতরে" বাজাইতেছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠকাইয়া উপাধি লাভের কাহিনী কহিয়া আলোক জুনিয়র ছাত্র-মহলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল।

ত্রিতলে উঠিয়া সৃষ্টিনাথ চাকরের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই

আলোটা ধরাইয়া চিঠিখানি পড়িতে বসিল। মেয়েলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষর, বর্ণাশুদ্ধিবহুল ও পারিপাট্যহীন,—তাহার চোখে নির্জ্জীব বলিয়া বোধ হইল পত্রখানি তাহার স্ত্রী সুরুচির—সম্পূর্ণ সেকেলে ধবণেব, পাঠের কোনও আড়ম্বর নাই, আবেগ বা উচ্ছ্বাসের কোনও সাড়া নাই, ঘরকন্নার মামুলী সংবাদ ও কুশল জিজ্ঞাসা, পরিশেষে একবার শ্রীচরণ দর্শন লাভের সৌভাগ্য হইবে কিনা এই প্রশ্ন—ব্যস্! ইহার অধিক কিছু পত্নীর কাছে সৃষ্টিনাথ কোনও দিন আশাও করে নাই, কাজেই নিরাশার বালাই তাহার ছিল না। তাহাদের বিবাহ হইয়াছে এই তিন বৎসর; কিন্তু কি জানি কেন, জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বন্ধন তাহাকে তেমন করিয়া বাঁধিতে পারে নাই। বুঝি বা সে যাহা চাহিয়াছিল পত্নীর ভিতর তাহার সন্ধান পায় নাই, নতুবা এই যুবকটিব জীবনে ত চিত্ত-বিক্ষোভকারী এমন কোনও ব্যাপার ঘটে নাই যাহা তাহাকে নিকটতম আত্মীয়টি হইতে অমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারে। অধ্যয়নানুরাগী সৃষ্টিনাথ যদিও পাঠের ব্যাঘাতের ভয়ে বাড়ী যাইত কম, তবুও সেখানে পত্নীর সহিত আলাপ পরিচয়ের সুযোগ না পাইয়াছে তাহা নয়; কিন্তু অন্তরের মাঝে তাহার সম্বন্ধীয় কোনও সুমধুব স্মৃতি সে বহিয়া আনিতে পারে নাই। পাঠে ঐকান্তিক আকর্ষণে দিনগুলি তাহার সরস হইয়াই কাটিত, কাজেই পত্নীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াও সে জীবনে রসাভাব বোধ করে নাই।

আজ পরীক্ষার অবসাদের পর বন্ধুদের সংসর্গ পথে আসিতে

আসিতে আলোকের মুখে তাহার পত্নীপ্রেমোজ্জল গৃহটির কথা শুনিয়া সৃষ্টির প্রাণে সহসা তেম্নি একটি ঘরের কথা মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে ঘর পতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও আবেশ করা কোনও ছবি সে চোখের কাছে দাঁড় করাইতে পারিল না। তবুও সৃষ্টিনাথ বাড়ী যাইবার জন্য জিনিসপত্র গুছাইয়া লইল, এবং পরীক্ষার ফলের সাথে সেই সংবাদটুকুও মাকে লিখিয়া জানাইল। সুরুচির চিঠির জবাব দেওয়ার বিশেষ আবশ্যক দেখিল না।



সাধারণতঃ পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যেমনটি হয় সুরুচিও ছিল তেম্নি ব্রীড়াবনতা লজ্জাবতী লতা। সে জানিত স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী উপাস্য—আর সে দীনা সেবিকা,—তাই স্বামীর সহিত একটা সম্ভ্রমের ব্যবধান রাখিয়া সে চলিতে চাহিত।

স্বামীর সহিত তাহার অধিক সাক্ষাৎ হয় নাই। বিবাহিত জীবনে এ যাবত মোট ছ'টি মাসও সৃষ্টি বাড়ীতে থাকে নাই। দিনের বেলা গৃহ পরিজনের সমালোচনা অগ্রাহ্য করিয়া স্বামী সম্ভাষণ গ্রাম্যবধূর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, এমন কি রাত্রিতে, বাড়ীর সবাই বিশ্রাম করিবার পূর্ব্বে স্বামীর ঘরে যাওয়াও পল্লী-বধূর পক্ষে অত্যন্ত অশোভন। যে বধূ যত বড় ঘোমটা টানিয়া স্বামী হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে গ্রাম্য সমাজে সেই বধূর তত প্রশংসা। তাহার শাশুড়ী ও ননদ গ্রাম্য সমাজের সেকেলে মনোবৃত্তি লইয়া গঠিত, তাই সে স্বামী হইতে দূরে সরিয়া থাকিত,

যদিও স্বামীর সহিত পরিচিত হইবার গোপন আগ্রহ তাহার ছিল যথেষ্ট।

অধিক রাত্রে স্বামীর ঘরে বিছানার পাশে জড়সড় ভাবে সে একটি উচ্ছ্বাসময় মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা কবিত, কিন্ত পাঠে নিমগ্ন স্বামীকে উপযাচিকা হইয়া সম্ভাষণ করিতে তাহার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিত।

ওদিকে সৃষ্টির বিবেচনা এ বিষয়ে ছিল সৃষ্টিছাড়া। পত্নীর কাছে সে আশা করিত অসীম, কিন্তু নববধূ যে লজ্জাবতী স্তবক,—সঙ্কোচের আড়ালে সে তার আধবিকশিত প্রেমমুকুলটি সযত্নে ঢাকিয়া রাখে, এ কথাটি সে ভাবিত না। আপনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই সে বাড়িয়াছে, এবং তাহার দাবী-দাওয়ার কেন্দ্রীভূত যারা তাদের কাছে সে অন্ধভাবে আশা করিতও অসীম। তাই পত্নী-প্রেমের ক্রমবিকাশ তাহার সহিল না, সে চাহিল একবারেই এ কচি বুকখানির প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যাইতে,—একটু ব্যতিক্রমে অসহ অভিমান জাগিতে লাগিল। যৌবনেব এই সময় প্রাণে আকাজ্ক্ষার ঢল নাবিয়া আসে, দাবী-দাওয়ার সম্পর্কের দোহাই দিয়া সৃষ্টি পত্নীর কাছে সে সব পূর্ণ করিতে চাহিত,—ভুলিয়া যাইত যে লাজুক তরুণী বধূ তার, তার বুক ফাটিতে পারে কিন্তু মুখ ফুটিবে না। তাহার বুঝিবা আশা ছিল গণৎকারের মত স্বামীর মুখ দেখিয়া স্ত্রী তাহার সমস্ত সাধ আকাজ্ক্ষার কথা জানিতে পারিবে,—তাই তাহার ব্যতিক্রমে সৃষ্টির ক্ষোভ হইত অসীম। গভীর রাত্রিতে পত্নী ঘরে আসিলে সারাটি দিনের অদর্শনে সৃষ্টি অভিমান-ব্যথায়

বহি লইয়া থাকিত, আবার জাগিয়া জাগিয়া বালিকা বধূ ঘুমাইয়া পড়িলে সৃষ্টি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত, এ একটা হৃদয়হীনা নারী। পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া তাহার লাজনত আঁখির মৌন দৃষ্টিতে সুগভীর প্রেম জ্ঞাপন সৃষ্টি জানিতে পারে নাই, কারণ সে চেষ্টা সে করে নাই।

এই ভাবেই দু'টি পরিপূর্ণ হৃদয় দু'জনার কাছেই অচেনা থাকিয়া গিয়াছে। অবশেষে সৃষ্টি ভাবিয়াছে অশিক্ষিতা ধনিকন্যা বিবাহ করিয়া ইহাপেক্ষা সুখ আশা বৃথা; এবং সে ভগ্নমনে নিজকে পাঠে, সুরুচি গৃহকর্ম্মে ডুবাইয়া দিয়াছিল, এবং এই ভাবেই যেন তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কচিৎ পত্র বিনিময়ও একটা নীরস কর্ত্তব্যে দাঁড়াইয়াছিল,—শাশুড়ী ননদ কেহ ইহাতে অসন্তুষ্ট হয় নাই।

তাহাদের এ ভাব প্রথম ধরা পড়িয়াছিল সৃষ্টির দূর-সম্পর্কিতা বোন্ পারুলের চোখে। বিবাহের পর নব-পরিমলে হৃদয়টি যখন ঢলঢলে হইয়া উঠে তখন ভাদ্রের ভরা নদীর মত উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ কণ্ঠ ছাপাইয়া বাহির হইতে চায়,—তাই এই নবোঢ়া পারুল যখন-তখন সুরুচির কাছে স্বামিপ্রেমের গোপন ইতিহাসটুকু কহিতে ছুটিত। তাই নিজের সুখের কথাগুলি এক নিশ্বাসে কহিয়া যখন সে দেখিত, কহিবার মত সুরুচির স্মৃতির ভাণ্ডারে কিছুই নাই তখন সুরুচির অবস্থাটা অনুমান করিয়া সমবেদনায় তাহার কোমল বুকটি ভরিয়া উঠিত। নিজের অবস্থাটাও সুরুচির চোখে প্রথম ফুটিল পারুলের সাহচর্য্যের ফলে। সে বুঝিয়া উঠিল—স্বামী শুধু ধ্যান-ধারণার

জিনিস নহেন, আরও মধুরতর সম্পর্ক তাঁহার সহিত আছে, যাহাতে অন্তর-রাজ্যে বসন্তসমাগম হয়, ফুল ফোটে, দখিণ মলয় বহিয়া আসে —তাহা প্রেম!···সেইদিন হইতে একটুখানি মধুর আকাঙ্ক্ষায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। এতদিন স্বামীর কুশলবার্ত্তা অন্যের চিঠিতে জানিয়াই সে নিশ্চিন্ত থাকিত কিন্তু এখন পিয়নের আগমনে কি যেন পাইবার আশায় তাহার বুকে পুলক-শিহরণ জাগিয়া উঠিত, কালো পাখীটাও তাহার মর্ম্মের মাঝে কত কথাই বহিয়া আনিত!···

সৃষ্টির পাসের ও আগমনের সংবাদ যেদিন এই ছোট গৃহখানিতে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল, সেদিন পারুল আসিয়া সুরুচির কাছে হাসিমুখে সন্দেশের দাবী করিতেই আরক্তমুখী বৌদিদিটি ছোট্ট একটি কিল দেখাইল। পারুল-বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "বাঃ রে এম্নি করেই বুঝি লোককে সন্দেশ খাওয়ায়, তাই ত দাদাটি ঘর-মুখো হতে চায় না।" তারপর সুরুচিকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "এ যে অভিসারিকার বেশ!" সুরুচি রাঙ্গা হইয়া বলিল, "যাও, তাই বুঝি? চুলে বালি পড়েছিল, আর কাপড় আজ ধোবায় গেছে।"

"এখন ঘন ঘন চুলে বালি পড়্‌বে, কাপড় ধোবায় যাবে, আমাদেরও ঢের অমন হয়েছে।" বলিয়া পারুল দুষ্টু হাসি হাসিল।

"আস্তে ভাই, মা আছেন, এদিকে এসো।" বলিয়া সুরুচি পারুলকে গৃহের অন্তদিকে লইয়া গেল। পারুল বলিল,

"দাদার চিঠিখানি দেখাবে না বৌদি ? কি লিখেছেন ? অনেক কথা, নয় ?"

সুরুচি সহসা বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। স্বামী যে তাহার চিঠিখানির উত্তর দেন নাই, একথা বলিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। বুঝিবা মনে হইল, ইহা কহিলে স্বামীর নির্ম্মমতার কথা প্রচার হইবে। এড়াইবার জন্য সংক্ষেপে কহিল, "কি দেখ্‌বে ভাই, আমাদের পুরনো হয়ে গেছে।"

"আর আমাদেরই খালি নূতন। সব চিঠিই ত তোমায় দেখিয়েছি। আচ্ছা—" বলিয়া পারুল রক্তাধর দু'টি ফুলাইল।

সুরুচি সঙ্কটে পড়িয়া কহিল, "কোনও খবর নেই তাতে।" পারুল নাছোড়বান্দা হইয়া বলিল, "না থাক্, তবু দেখ্‌ব। না দেখাও ত আড়ি বলে দিচ্ছি ভাই। ফাঁকি দিয়ে আমার সব দেখে—আচ্ছা—," বলিয়া পারুল সত্য সত্যই আড়ি করিবার আয়োজন করিল।

বিষণ্ণ দু'টি চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে ফিরাইয়া সুরুচি কহিল, "আমাকে লিখেন নি ত।" চক্ষু দু'টি যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া পারুল এমন বিস্ময় প্রকাশ করিল যেন ইহার চেয়ে অবাক্ হইবার কথা পৃথিবীতে আর নাই। যে ঘটনাটি এতক্ষণ সরলা সুরুচির প্রাণে গভীর কোনও অর্থের আবিষ্কার করিতে পারে নাই ; পারুলের আচরণে তাহাতে এমনি অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়িল যে সুরুচির বিষণ্ণ নয়ন দু'টি আপনা হইতেই টস্‌টসে হইয়া উঠিল। পারুল সহানুভূতি জানাইয়া বলিল, "কি লিখেছিলে তুমি বৌদিদি ?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সুরুচি চিঠির মর্ম্ম কহিলে পারুল গালে হাত দিয়া কহিল, "তুমিও বৌদি হাবা মেয়ে। তিন বচ্ছর যে হয়েচে তোমার যে চিঠি লিখেচ তা বিয়ের রাতেও আজকালকার মেয়েরা সোয়ামীর কাছে লিখে তৃপ্তি পায় না। সেকেলে দিন কি আছে যে স্বামীকে দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌তে হবে। স্বামী কি বাঘ না ভালুক? সেকেলে মেয়েরা স্বামীকে তাই ভাব্‌ত, জীবনেও সুখী হত না আমার মনে হয়। যতদিন না সঙ্কোচ ঠেলে দিয়ে স্বামীকে কাছে টেনে নেওয়া যায় ব্যবধান ততদিন ঘোচে না,—এটা উপন্যাসের কথা নয়, নিছক সত্যি। ভালবাসা জিনিসটা এম্নি, তাতে বনের পশু বশ করা যায়, আর এ ত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ।"

সুরুচি রাঙ্গা হইয়া বলিল, "তোমার যত কথা ঠাকুরঝি। ওসব বুঝি আবার মুখ ফুটে জানাতে হবে। মেয়েদের স্বামী ছাড়া ভাব্‌বার কে আছে, ও সব ত জানা কথাই, কে না বোঝে? একালে সেকালে তিনিই ত দেবতা।"

পারুল কিছুক্ষণ সুরুচির পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "সত্যি কথা বলেছ বৌদি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ক'জনার আছে? বুদ্ধিমান্ বলে পুরুষগুলো যত চেঁচামিচি করুক না কেন ওদের মত নিরেট বোকার জাত ছুনিয়ার ছু'টি নেই। অভিনয়টাই শুধু ওরা যাচাই করে নেয়। যার স্ত্রী যত প্রেমের অভিনয় কর্ত্তে পারে তার কাছে সে তত আদরিণী হয়।..... বিয়ের রাতেই যে স্ত্রী ঘোম্‌টা ফেলে উপন্যাসের নায়িকার মত স্বামি-সম্ভাষণ কর্ত্তে পারে পুরুষগুলো তাকেই আদর্শ মেনে নেয়। এমন দৃষ্টান্ত অনেক

দেখেচি। আমারটিও তোমারটিও, তবে উনিশ আর বিশ। কাজেই অভিনয় কর্ত্তে হয়।"

সুরুচি হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তুমি এতও বল্‌তে পার ভাই। সে সব কিছু নয়। আমার মনে হয়, আমি তাঁর উপযুক্ত নই, তাঁকে সুখী কর্ত্তে পারি নি, তিনি যা চেয়েছিলেন আমাতে তা পান নাই। —মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমরা।" পারুল রাগিয়া গেল, বলিল, "আর তিনিই বা কোন্ লাটসাহেব গো। তোমার স্বামিনিন্দা কর্ল্লে রাগ্‌বে, কিন্তু সাধারণ কর্ত্তব্য জ্ঞানটুকু যে লেখাপড়া শিখে জন্মায় না অমন লেখাপড়ার মুখে আগুন, পাশকরা বিবিই যদি তার পছন্দ ছিল, তখন বুকের পাটা বড় করে বল্লেই হ'ত, অমনটি ছাড়া বে কর্ব্বে না। যাকে আজন্মের মত দয়া করে পায়ে স্থান দেন, দয়া করে তার সম্বন্ধে এটুকুও ভাবা উচিত সে সুখদুঃখ বোধের মত তারও একটা আত্মা আছে,—প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।"

পারুলের বক্তৃতার ভঙ্গিতে সুরুচির মনটা হাল্কা হইয়া উঠিয়াছিল, সে রঙ্গ করিয়া কহিল, "আর লাটসাহেবদের বুঝি এসব ভাববার দরকার হয় না। স্বামীও যে মেয়েদের লাটসাহেব।"

ভ্রূদু'টি কুঞ্চিত করিয়া পারুল কহিল, "হাঁ,মগের মুল্লুকের লাট-বটে! আমার ইচ্ছা হয় কি জান? যদি প্রমীলার মেয়ে-রাজ্যের মত একটা রাজ্য থাকৃত! দেবী চৌধুরাণীর গল্পটি আমার বেশ লাগে, কারণ সাগর ব্রজেশ্বরকে দিয়ে পা টিপিয়েছিল। আচ্ছা জব্দ,—স্বেচ্ছাচারী জাত!"

পারুলের উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া অপর ঘর হইতে সুরুচির শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে ? কার ওপর রেগেছিস্ ?"

পারুল বলিল, "কার ওপর আবার। তোমারই গুণধর ছেলের কীর্ত্তি আলোচনা কচ্চি। কি যে মধু কল্‌কাতায়। ঘরের দিকেও ত চাইতে হয় পুথি পড়ে পাস কল্লেই খালি হয় না। তোমাদেরও দোষ আছে, মান্ধাতার আমলের সেই ভুল বিশ্বাস নিয়ে আছ যে বৌয়ের ওপর টান হলে ছেলে পর হয়ে যাবে। কিন্তু বাইরে যে পর হবার মত মাকড়সার জালের চেয়েও মারাত্মক ফাঁদ আছে, তোমাদের সহজবুদ্ধিতে তা আসে না।"

সুরুচি তৎক্ষণ রান্নাঘরের ভিতর যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার শাশুড়ী বাহিরে আসিয়া ভীত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন "কেন, কি হয়েছে রে সৃষ্টির ?"

গম্ভীর মুখে পারুল বলিল, "হয় নি কিছু, কিন্তু তোমাদের বাড়ীর যে বন্দোবস্ত দেখ্‌চি, হবার যে বিশেষ দেরী নেই তোমার বুড়ো চোখের চেয়েও আমার কাঁচা চোখ দিয়ে বেশী স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।" বৃদ্ধা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

৪

ট্রেণ ফেল করায় সেদিন আর সৃষ্টির বাড়ী যাওয়া হইল না। তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না, পরদিন যাওয়া স্থির করিয়া সৃষ্টি মেসে ফিরিয়া আসিল। বৌবাজার হইতে বাড়ীর জন্য কতকগুলি

জিনিস কিনিয়া আনিয়া পরদিন দুপুরে সৃষ্টি ট্রাঙ্কে পূরিতেছিল, এমন সময় কিরণ খবরের কাগজের হাওয়া খাইতে খাইতে সৃষ্টির ঘরে ঢুকিয়া কহিল,"আজ যাচ্ছ নাকি ? ঢের সওদা কল্লে দেখ্‌চি।"

"না, তেমন কিছু নয়," বলিয়া সৃষ্টি আপন মনে জিনিসগুলি গুছাইতে লাগিল। কিরণ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া খবরের কাগজে খানিকক্ষণ দৃষ্টি বুলাইল, এক একবার মুখ তুলিয়া সৃষ্টির পানে চাহিল। বোঝা গেল, তাহার এমন কিছু কহিবার ইচ্ছা যাহার অবতারণা করিতে সে একটু দ্বিধা বোধ করিতেছে। সৃষ্টি কহিল, "আমার গোছান ঠিক হচ্ছে না বুঝি ?"

"হচ্ছে বৈ কি," বলিয়া কিরণ নীরবে কাগজখানি উল্টাইল। বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছ বুঝি ? আছে কিছু ?"

"ছাই আছে। ময়মনসিংহে এক হেড্‌মাষ্টার চাচ্ছে, এম, এ হওয়া চাই, দু'বছরের গ্যারেন্টি, অথচ মাইনা সত্তর। বাগ্‌নানেও একটা খালি আছে, আশি টাকা মাইনা। ম্যালেরিয়া আছে বোধ হয়। আর বিজ্ঞাপনের আশি, আদত মাইনে হয়ত সত্তর।"

সৃষ্টি মুখ তুলিয়া কহিল, "কি রকম ?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তা জান না বুঝি ? অনেক স্কুলে তাই করে। কাগজে কলমে মাষ্টারের মাইনা যা থাকে, দেবার বেলা দেয় তার চেয়ে ঢের কম, অথচ রসিদ নেয় পুরাপূরি। স্কুলের ওজন বাড়াবার জন্য এই ঠকামো।"

সৃষ্টি হাসিয়া বলিল, "সত্যি নাকি ? জুচ্চুরি শিক্ষা বিভাগেও ঢুকেচে ! ভাল কাজ খালি নেই কোথাও ?"

মাথা নাড়িয়া কিরণ বলিল, "উঁহু। চাকৃরীর যে বাজার, পানের দোকান দিলেও এর চেয়ে ভাল।" তারপর একটু নড়িয়া বসিয়া কাসিয়া বলিল, "আজ তোমার না গেলে নয়।"

সৃষ্টি চোখ তুলিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, "কেন হে? ব্যাপারখানা কি?" আবার কাসিয়া লইয়া কিরণ বলিল, "আছে হে আছে।"

ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করিয়া কাছে আসিয়া সৃষ্টি বলিল, "কি হে?"

কিরণ বলিল, "আমার পিসেমশায়কে জান ত সম্প্রতি যিনি সাকুর্লার রোডে থাকেন। তাঁরা নববিধানের। খুব খাঁটি লোক তাঁরা। সেখানেই আজ গিয়েছিলাম। আমার পিস্তুতো বোন স্মৃতিকে—খুব ভাল লিখিয়ে সে, তুমি ত মাসিক পত্র পড় না, তার লেখা বোধ হয় পড়ও নি, কথা প্রসঙ্গে তোমার সেদিনকার কথা. বলে ফেলেছিলুম। তারপর—"

সৃষ্টি ভ্রূদু'টি কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কোন্ দিনকার কথা?"

"সেদিনকার সুরের বাদল রাতে গান শুনে তোমার ঐ যে—"

সৃষ্টি হঠাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তারপর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "ভারি অন্যায় তোমার অমন যাচ্ছেতাই গল্প করা। কি বিশ্রী তুমি।" লজ্জায় তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল।

কিরণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "গল্প করাটা ঠিক হয় নি এখন বুঝি, তখন বুঝ্তে পারিনি, কারণ সাহিত্য ও কাব্যের

আলোচনায় তখন এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম যে,এ সব খেয়ালই ছিল না। স্মৃতি বল্‌ছিল, কবিরা তাঁদের গানের ভেতর প্রাণের সঞ্চার কর্ত্তে পারেন, সেই প্রাণ যতক্ষণ ফুটে না বেরয় কাব্য ততক্ষণ কতকগুলি সাজানো আঁখর আর ছন্দের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে। আমি বল্‌ছিলেম, সে ভুল কথা, কবিরা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আবেষ্টনী তৈরী করে দেয় তাতে প্রাণ সঞ্চার করে নিয়ে উপভোগ কর্ত্তে হয়,—কারণ এমন লোক দেখা গেছে যাদের কাছে গানের আঁখরগুলো নির্জ্জীব; কিন্তু যখন সুরলয় লয়ে বেরয় তখন তা সজীব হয়ে ওঠে। তর্কের মুখে আমার কথাটা প্রমাণ কর্ত্তে তোমার সেদিনকার কথাটাই বলে ফেলেছি। শুনে সে ত প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল; বল্লে, নিশ্চয় তাঁর ভেতর ভাবের একটা স্রোত ফল্গুর মত তর্ তর্ করে বয়ে যায়, তোমরা তা দেখ্‌তে পাও নি। পড়াশুনা ও অন্যান্য কাজের ভেতর প্রাণটি তাঁর ঘুমিয়ে ছিল, ঐ সুর শুধু তাঁকে জাগিয়ে দিয়েছে। এখন যে কোনও ভাল কাব্য তাঁকে স্পর্শ কর্ব্বে, এ না হয়েই পারে না। তারপর—”

সৃষ্টির বিরক্তি ভাব একটু দূর হইয়াছিল, সে তাহার দৃষ্টিটাকে অন্তরের ভিতর প্রেরণ করিয়া দিল।

কিরণ বলিতে লাগিল, “তারপর স্মৃতি অনুরোধ জানালে তোমাকে একবার নিয়ে যেতে। জান ত তারা পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালী পরিবার নয়, দাদার বন্ধুর সাথে পরিচিত হওয়া তাদের লজ্জার বা দোষের কথাও নয়। তার আরো দু-একটি সাহিত্যিক বন্ধু

আস্‌বে, তাদের ইচ্ছা একটি উচ্চ অঙ্গের মাসিক প্রকাশ করা, তোমাকেও একজন লেখক বলে বেছে নেওয়া বোধ হয় উদ্দেশ্য।"

সৃষ্টি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "লেখক বলে বেছে নেওয়া আমাকে। কাব্যের 'ক' আমার ভেতর নেই জান ত তোমরা।"

"আমরা ত জানি, কিন্তু সে তা মান্‌ল কৈ। জানিনা কবিরা কষ্টিপাথরে কি ভাবে কষে নেয়। যাবে ত, নৈলে ভারি দুঃখিত হবে সে।"

অল্পক্ষণ সৃষ্টি মাথা হেঁট করিয়া ভাবিল, তারপর সহসা প্রবল-ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না না, সে হতেই পারে না, সে ভারি বিশ্রী হবে। পাড়াগেঁয়ে মানুষ আমরা, অনাত্মীয়া মেয়েদের মুখ চেয়ে কথাও কইতে পার্‌ব না, ভারি অপ্রস্তত হয়ে আস্‌ব ; তারা নিতান্ত অসভ্য ঠাওরাবে। তারপর তুমি সেদিনকার কথাটাও বলে ফেলেছ,—কি লজ্জা!"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "তুমি ভারি লাজুক, পুরুষ মানুষের এত লজ্জা কি হে! অনেক দেশে স্ত্রীপুরুষে অবাধ মেলামেশা করে, তার ফলে মেয়েরা পুরুষের সহযোগিনী সহকর্ম্মিণী হয়ে দাঁড়ায়, সমাজও বলীয়ান্‌ হয়ে ওঠে। আর আমাদের সমাজ স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণের নামে যে আঁৎকে ওঠে, আমার মনে হয় এটা দুর্ব্বলতা, মানসিক বলের অভাব ; খারাপ দিকটাই আমরা আগে নজর করি, কারা-প্রাচীরে মেয়েদের বদ্ধ করে রেখেও কি সব সময় তার হাত এড়ান যায়? সব সময় সকল জায়গায়ই ভাল মন্দ দেখা

যায়।···লেখাপড়া শিখেও নিজকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভেতর রাখাটা ঠিক নয়। তুমি যাবে ত? কথা দিয়েছি আমি।"

সহসা হাত দু'টি জোড় করিয়া সৃষ্টি কহিল, "পার্ব্ব না ভাই, মাপ কর। যে সমাজে গঠিত হয়েছি তার সংস্কারের গণ্ডীটা ঝেড়ে ফেলা আমার ক্ষমতার বাইরে।"

"আর আমি বুঝি আলাদা সমাজেব! সে যুগ কেটে গেছে, সমাজে এখন ঢের উদারতা এসেচে। দেখ্‌চ ত হিন্দু মেয়ের এখন বিয়ের পর স্কুলে যাওয়াও নিন্দনীয় নয়। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমি এম্নি ভাবে আলাপ করে দেব, সঙ্কোচ একটুও থাকবে না।"

বেলা না পড়িতেই কিরণ আসিয়া সৃষ্টিকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া বসিল। সৃষ্টির কোনও ওজর আপত্তি টিকিল না; কিরণ একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে লইয়া চলিল। সারাটি পথ সৃষ্টি আনমনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই লজ্জায় অধীর হইতে লাগিল। অপরিচিতা বয়স্কা মেয়ের সহিত কখনো সে মিশে নাই, সে সুযোগও ঘটে নাই, কেমন করিয়া যে শিষ্টতা রক্ষা করিয়া এ সব সমাজে কথা কহিতে হয় সে বিষয়েও সে অনভিজ্ঞ। আজিকার এই অভাবনীয় পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিনতম পরীক্ষা হইতেও কত কঠিন ভাবিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। সার্কুলার রোডের প্রকাণ্ড বাড়ীটার ভিতর ঢুকিতেই সৃষ্টির বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল, সে শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, "মাপ কর ভাই, অনেকটা তোমায় এগিয়ে দিয়েছি, এবার যাই, ঢের কাজ আছে আমার।"

কিরণ ফিরিয়া বলিল, "কি যে পাগল তুমি! ভয়ঙ্কর অভদ্রতা হবে, শিষ্টতা অশিষ্টতা সব সমাজেই আছে। কিচ্ছু ভয় নেই তোমার, আমি সাথে আছি। একটু আলাপ হলেই দেখ্‌বে কি সভ্য এরা। এ ভাবে গেট থেকে ফিরে যাওয়া যে আরো অভদ্রতা হবে। এসো—।" তাহার হাতখানি মুঠার ভিতর ধরিয়া কিরণ ষ্টেয়ারকেস্‌ বাহিয়া উপরে উঠিল।

সাম্‌নেই ড্রইং রুম,—পরিপাটি সাজান। মেঝে মূল্যবান্‌ গালিচায় মোড়া, সবুজ রংএর দেওয়ালে ফ্রেমে আঁটা মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে কাচের আলমারীতে বহির রাশি, জানালা দরজায় মূল্যবান পর্দ্দা, মাঝখানে মার্ব্বেল পাথরের প্রকাণ্ড টেবিল, চারিদিকে গদি আঁটা চেয়ার, কোচ। একটি প্রশান্ত বদন শ্বেতশ্মশ্রু প্রৌঢ় চস্‌মা চোখে নিবিষ্ট মনে বহি পড়িতেছিলেন, তাহাদের আগমন শব্দে চোখ তুলিয়া চাহিয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "কে কিরণ? এটি কে?"

"আমার এক বন্ধু, এক সঙ্গেই থাকি আমরা। এবার ইংরাজি সাহিত্যে ফার্ষ্ট ক্লাস পাস করেচেন।"

প্রৌঢ় তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "ও এরই নাম বুঝি সৃষ্টিনাথবাবু। বসুন, বসুন, তুমিও বস কিরণ। সৃষ্টিনাথ হাত দু'টি কপালে ঠেকাইয়া তাহাকে নমস্কার করিলে প্রৌঢ় কৃপাময়বাবুও প্রত্যভিবাদন করিলেন।

দু'জনে দু'টি চেয়ারে বসিলে কৃপাময়বাবু বলিলেন, "ল আছে বুঝি? ওকালতি কর্ব্বার ইচ্ছা আছে কি?"

সৃষ্টিনাথ নম্রস্বরে জানাইল, সে ল পড়ে নাই, অধ্যাপনার দিকেই তাহার বেশী ঝোঁক।

কৃপাময়বাবু প্রীত হইয়া বলিলেন, "তাই ভাল, যথেষ্ট আত্ম-চর্চ্চার সময় মিলে এবং দিব্বি নিরিবিলি জীবন। তোমার কি ইচ্ছা কিরণ?"

কিরণ বলিল, "আমরা কোনও রকমে উৎরে গেছি, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় কিছু এসে যায় না। যা যোটে তাই মাথা পেতে নিতে হবে।"

কৃপাময়বাবু মাথা দোলাইয়া বলিলেন, "উঁহু এটা ঠিক কথা হল না। সকলের জীবনেই একটা লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য এই চাই, বা এই হব, বল্লেই হল না, যথেষ্ট অধ্যবসায় ও আত্ম-শক্তির উপর নির্ভরতা দরকার,—সে রকম যার আছে সে নিশ্চয় উন্নতি কর্ত্তে পারে।"

কিরণ অম্লানমুখে সমস্ত দোষটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপাইয়া দিয়া কহিল, "স্কুল কলেজে সে রকম শিক্ষা আদৌ দেওয়া হয় না, তা খালি পুঁথি পড়ে পরীক্ষা পাস কর্‌বার আন্দাজ এবং নিতান্তই পুঁথিগত, তাই পুঁথির বাইরে এসে বিস্তীর্ণ কার্য্যজগতে পড়ে সমস্ত গোলমেলে হইয়া যায়, এবং চাক্‌রী বা উপযুক্ত ব্যবসা ফাঁদবার সংস্থানও বুদ্ধি অভাবে গ্রাজুয়েটরা যে-সে কাজই মাথা পেতে নেয়, —কারণ অন্নাভাব ঘরে ঘরে।"

কৃপাময়বাবু বলিলেন, "শুধু তাই নয়, মানুষও আজকাল হয়েছে আরামপ্রিয়, তাই লড়াই কর্ত্তে চায় না। চেষ্টা উদ্যোগ

করে খেটে-খুটে একটা নূতনতর কিছু উদ্ভাবন করে হাজার হাজার রোজগারের চেয়ে ত্রিশ চল্লিশ টাকার দশটা-পাঁচটার আফিসই তারা ভাবে বেশী লোভনীয়। ব্যবসা কর্ত্তে যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় দরকার।”

সৃষ্টিনাথ সঙ্কোচ একটু দূর করিয়া কহিল, “আমার মনে হয়, অন্নসমস্যা দূর কর্ব্বার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশি রাশি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল, টেক্‌নিকাল, কমার্সিয়েল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকাল্‌চারেল কালেজ খোলা উচিত। জেনারেল বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েই ছেলেদের ঐ সবে যেতে লুব্ধ কর্‌তে হবে, যেন প্রতি বৎসর আমরা ক্ষীণ স্বাস্থ্য, উপার্জ্জনহীন, অসন্তুষ্ট কেরাণী ও উকিলের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিক পেতে পারি। বলুন ত রসায়ন ও পদার্থ বিদ্যায় এম্ এস্-সি উপাধিধারী যুবক যদি উকিল বা কেরাণী হয়ে এক বচ্ছরে তার সমস্ত আহৃত জ্ঞান ধুয়ে মুছে ফেলে, যদি ব্যবসা ও আবিষ্কারের দিক দিয়ে তার অর্জ্জিত জ্ঞানের কোনও বিকাশ না হোল তা কি তাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত অগৌরব নয়? একই শ্রেণীর ডিগ্রী নিয়ে ভিন্ন দেশের যুবকেরা নিত্য নব আবিষ্কার কচ্ছে, আর আমাদের উচ্চ উপাধিধারী কোনও যুবক আজ অবধি সামান্য একটা স্থচও ব্যবসার জন্য তৈরী কর্‌তে পারে নি! ··চাষবাস পশু ও মৎস্যের ব্যবসা, এ সবের কোনটা বৈজ্ঞানিকভাবে আরম্ভ করে যুবকেরা তাদের বিজ্ঞান চর্চ্চা সাফল্য মণ্ডিত করেছে?···এই উর্ব্বরা দেশকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ গুণ অধিক উর্ব্বরা করে তোলা যায়,—

কিন্তু সেদিক দিয়েও কোনও যুবক যেতে চায় না।···কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকে দৃষ্টি আবশ্যক। তাদের বোঝা উচিত, এম্-এ, ল, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের যাতে ছেলেদের ভবিষ্যৎ অন্ন-সমস্যার সমাধান হয়, কারণ মস্তিষ্কের চেয়েও উদরের দাবী প্রচণ্ড। জেনারেল বিভাগের উচ্চ শিক্ষা মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাক। তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম, কাজেই জেনারেল বিভাগের শিক্ষার সঙ্কোচ করে টেক্‌নিকাল্ ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শিক্ষার প্রসার একান্ত আবশ্যক।”···

কৃপাময়বাবু খুসী হইয়া কহিলেন, “ঠিক বলেছ। টেক্‌নিকাল্ বিদ্যার চেয়ে জেনারেল লাইনে লোকের ঝোঁক শুধু উপাধির জন্য, কিন্তু উপার্জ্জনের জন্য উপাধির দাম কত কমে গেছে কারু তা বুঝ্‌তে বাকি নেই। হাজার হাজার উপাধিধারী যুবক আজকাল উপাধিহীন ব্যবসায়ীর দোরে উমেদারী করে সামান্য চাকুরীর জন্য! বিশ্ববিদ্যালয়ের এদিকটায় নজর করা উচিত, কারণ অন্ন সমস্যায় লোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অশ্রদ্ধা এসে পড়্‌চে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল, টেক্‌নিকাল এর একটিও জেনারেল বিভাগের চেয়ে ফেলা যায় না। তা ছাড়া ফাইন আর্টস্, আয়ুর্ব্বেদ এ সবেরও একদিন এ দেশে যথেষ্ট চর্চ্চা ও সমাদর ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উৎসাহ অভাবে লোকে সেই সব ছেলেদের এ সব পড়তে দেয় জেনারেল বিভাগে যাদের মেধার অভাব। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্তব্য এই সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে জেনারেল বিভাগের সমকক্ষ করে তোলা। উদরকে উপেক্ষা করে

মস্তিষ্কের চর্চ্চা কাব্যে সম্ভব,—বাস্তব ক্ষেত্রে নয় আমি সহস্রবার বল্‌ব।”

প্রসঙ্গ ক্রমে দেশের আলোচনা হইতে সাহিত্যের দিকে গেল। ইংরাজ ও গ্রীক কবিদের কাব্যালোচনায় স্থষ্টির অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাইয়া কৃপাময়বাবু স্থখী হইলেন, কিন্তু বাঙ্গলা লেখকদের প্রতি তাহার ঔদাসীন্য দেখিয়া রঙ্গ করিয়া কহিলেন যে, “নোবেল প্রাইজ বিতরণের ভার বাঙ্গালীর উপর থাকিলে কোনও বঙ্গকবির উহা পাইবার সৌভাগ্য কস্মিন্‌কালে হইত না।”

স্থষ্টি লজ্জিত হইয়া কহিল যে, “এইবার সে বাঙ্গলা সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে, কলেজে সে স্থযোগ ও অবসর তাহার ঘটে নাই।”*

কৃপাময়বাবু সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, “আপনাদের মত কৃতী লোকের কাছে বাঙ্গলা-সাহিত্য যথেষ্ট আশা করে। জাতির পরিচয় তার সাহিত্য, কাজেই বঙ্গ-সাহিত্য চর্চ্চায় মন দেওয়া আপনার মত কৃতী লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য।···আমার অত্যন্ত দুঃখ হয় যে এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক বাংলা-সাহিত্যকে অবহেলা করেন। বিদেশী সাহিত্য চর্চ্চা কর্‌তে তাঁরা গৌরব মনে করেন, অথচ তারা বোঝেন না এই অবহেলায় বঙ্গ-সাহিত্যের তেমন পরিপুষ্টি হচ্ছে না। যত্নের অভাবে খুব ভাল গাছের চারাও মরে যায়। তাকে বাঁচাতে হলে যত্ন করে ক্রমবিকাশের অপেক্ষা

* তখনো বাঙ্গলায় এম্‌ এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই।

কর্ত্তে হবে। সেই আত্মবোধ থাক্‌লে যত্ন আসে। কি দুঃখের কথা যে সাহিত্যসেবা করে এখনও এ দেশে একজনের জীবিকা চলে না, অথচ এর মত পবিত্র ব্রত ক'টি আছে ?···আমি দেখেচি অনেক শিক্ষিত লোক বাংলা বইয়ের নামে নাক সিট্‌কে বলেন, ট্রাশ্‌, অথচ তার একটিও নিজে পড়েন নি। জাতীয়-সাহিত্যের প্রতি এমন অহেতুক অবহেলা বোধ করি খালি এই জাতেই সম্ভব !·· আমার মেয়ে স্মৃতি বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের দিকে তার খুব ঝোঁক, আমিও খুব উৎসাহ দি। তারা ক'জন মিলে একটি মাসিক পত্রিকা চালাতে চায়,—লিখ্‌বেন তাতে।"

সৃষ্টি বিনীতস্বরে কহিল, "বাংলায় আমার দখল নেই, লিখিও নি কোনও দিন।"

কৃপাময়বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মত অন্তর্দৃষ্টিশালী কৃতী লোক যা লিখ্‌বেন তাই সাহিত্য হবে। আপনার চিন্তাশক্তি প্রশংসনীয়, তা আপনার সাথে আলোচনায় টের পেয়েছি, শুধু ফুটিয়ে তোল্‌বার অপেক্ষা।"

নীচের গাড়ীবারান্দায় মোটরের ভস্‌ভসানি শ্রুত হইল। সোফার আসিয়া জানাইল মোটর তৈয়েরী। কৃপাময়বাবু দাঁড়াইয়া কহিলেন, "স্মৃতির সঙ্গে সৃষ্টিবাবুকে পরিচয় করে দিও কিরণ! আমার একবার প্রভাতবাবুর বাড়ী যেতে হবে।"

সৃষ্টিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইতে কৃপাময়বাবু তাহার পিঠে সস্নেহে হাত দিয়া বলিলেন, "বসুন, আপনি অতিথি। জরুরি কাজে

এখনি আমাকে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে কর্ব্বেন না।” তিনি নীচে নামিয়া গেলেন, মোটর গেটের বাহির হইয়া গেল।

সৃষ্টির মনটা বেশ হাল্কা হইয়া উঠিয়াছিল, সে কিরণকে বলিল, “দিব্বি মানুষটি।” “আরো ভালো মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি” বলিয়া পর্দ্দা সরাইয়া কিরণ পাশের ঘরে চলিয়া গেল।



সৃষ্টিনাথ বসিয়া কাচের আলমারীর বহিগুলিতে চোখ বুলাইতে-ছিল, সহসা কিরণের ডাকে ফিরিয়া চাহিয়া সন্ত্রস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কখন যে পাশের দুয়ার দিয়া কিরণ ও স্মৃতি ঘরে আসিয়াছে সৃষ্টি টের পায় নাই, এমনই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল সে। স্কুলের পড়োর মুখস্থ করা পাঠের মতই কিরণ বলিয়া গেল, “ইনিই আমার বন্ধু সৃষ্টিনাথবাবু, ইংরাজি সাহিত্যে ফার্ষ্ট ক্লাস এম্, এ, সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান। আর এটি আমার পিস্তুতো বোন স্মৃতি, বেথুনে থার্ড ইয়ারে পড়েন, বিবিধ মাসিকের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা।”

তাহার বলিবার ভঙ্গিতে স্মৃতি মুখ নীচু করিয়া হাসিল। সৃষ্টি রাঙ্গা মুখে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, ক্লাসে পাঠ বলিতে উঠিয়া মুখস্থ পাঠ ভুলিয়া মাষ্টারের সাম্‌নে ছাত্রের যেরূপ অবস্থা হয় অনেকটা সেই অবস্থায়। এই সুশিক্ষিতা অপরিচিতাটির সহিত শিষ্টতা বজায় রাখিয়া কি কথা কহিবে এতক্ষণ মনে মনে মুখস্থ করিয়া রাখিলেও কার্য্যকালে সব গুলাইয়া যাওয়ায় সৃষ্টির

অবস্থাটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গীন অবস্থা বুঝিয়া তাহাকে আগুলাইবার জন্যই কিরণ পরিচয়ের কতকগুলি ডালপালা সৃষ্টি করিয়া তুলিল, যাহাতে সৃষ্টি তাহার ভুলিয়া-যাওয়া পড়াটা কোনও প্রকারে স্মরণ করিয়া লইল। ইতিমধ্যেই ছোট্ট দু'টি শুভ্র হাত তাহাকে অভিবাদন জানাইয়া ফেলিয়াছিল, সৃষ্টিও প্রত্যভিবাদন করিল।

সৃষ্টি যথাসাধ্য বল সংগ্রহ করিয়া কোনও প্রকারে বলিল, "আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বড়ই সুখী হলেম, আপনার লেখার খ্যাতি অনেকের কাছে শুনেচি।" কথাটা সৃষ্টি ঠিক কহিল না, কারণ কিরণ ছাড়া কাহারো কাছে সে ইহার কথা পূর্ব্বে শোনে নাই।

স্মৃতি বলিল, "বসুন। কিরণদার কাছে আপনার কথা শুনেই আমি আপনার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে ব্যস্ত হয়েচি। আমার একটা আশ্চর্য্য রোগ আছে, Dowdenএর Shakespear's Mind and Art পড়ে হয়ত সেটা জন্মেছে। কোনও কবির কথা শুনলেই আমার তাকে study কর্ত্তে ইচ্ছা হয়। কালীদাস মাইকেল নবীন সেন বেঁচে থাকলে বোধ হয় তাদের study কর্ব্বার লোভ আমি সামলাতে পাৰ্ত্তেম না।"

সৃষ্টি অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "কিরণ তাহলে আমার সম্বন্ধে আপনাকে ভুল পরিচয় দিয়েছে। আমি কবি নই, কোনও দিন লিখিও নি, লিখতে যে কোনও দিন পার্ব্ব সে শক্তিও আছে বলে মনে হয় না।"

স্মৃতি চোখ তুলিয়া চাহিয়া আবার নতদৃষ্টিতে আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, "অথচ কাব্য আপনাতে যথেষ্ট আছে আমি জেনেছি। তাই আমার জান্‌তে :আগ্রহ হয়েছিল কিসের ছোঁয়ায় মানবের ঘুমন্ত ছন্দগুলি জেগে ওঠে। আমার মনে হয় এবং দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে ছন্দ জাগ্‌বার মত তার কাছে,—অদৃশ্য একটা স্পর্শ পেয়ে তা সুরে-লয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সেটা স্পর্শ বা প্রেরণা যাই বলুন না কেন, মধুব একটা কিছুর আঘাত লেগে যখন হৃদয়ের তারটিব স্পন্দন আরম্ভ হয় তখনি কাব্যেব সৃষ্টি এবং তারি ভেতর দিয়ে কবির প্রাণটি ফুটে বেরয়। সে স্পর্শের তারতম্যে কাব্যও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়ায়।···আপনার তারটিতে যখন সে স্পর্শ লেগেছে আপনাকে কবি হতেই হবে। সুরের অভাবই ঘুম, সুরেব স্পর্শ জাগরণ। সে জাগরণের পর মানুষ আর ঘুমাতে পারে না।"

সৃষ্টিনাথ অবাক্ হইয়া গেল,—সেদিনও যে এই কথা তাহাব প্রাণে আপনা হইতেই ফুটিয়াছিল। তাহার গোপন স্বপ্নটির সন্ধান ইনি কি করিয়া পাইলেন। আশ্চর্য্য নারী! শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে সৃষ্টিনাথ একবাব তাহার মুখের দিকে চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, "ঠিক এম্নি কথা আমি একদিন ভেবেছিলাম। আপনি ঠিক সেই কথাই বলে গেলেন। আর ক'বছর আগে হলে আমি ভাব্‌তুম আপনি মন্ত্র জানেন।"

কিবণ ও স্মৃতি হাসিয়া ফেলিল। কিরণ বলিল, "মন্ত্র জানে বৈ কি। দেখ্‌তে পাও ত পাকা সমালোচকরা হাজার বছর

আগেকার কবিদের সমস্ত পরিচয় তাদের লেখা থেকে টেনে বার করে। আর ক'দিন পর হয়ত এমন দেখ্‌বে যে সমালোচকদের প্রসাদে কোন্ কবি কি দিয়ে খেতেন, ক'ঘণ্টা ঘুমুতেন, মোটা ছিলেন কি রোগা ছিলেন সমস্ত তথ্য তাঁদের লেখা থেকে বেরিয়ে পড়বে, যেমন কাকচরিতরা কপালের রেখা দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব বলে দেয়।”

স্মৃতি কৌতুক হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, “তোমার সব তাতেই ছেলেমান্‌ষী কিরণদা। চেহারা নয়, তবে লেখায় কবির প্রকৃতি বোঝা যায় বৈকি, একটু তলিয়ে পড়লেই তা চোখে ভাসে। কারণ প্রত্যেক লেখক তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে জীবনে যে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাই প্রচার করে যান। সেই প্রচারের সাথে তাঁর প্রকৃতির মাধুরী ও দুর্ব্বলতা সমস্ত ফুটে বেরয় এবং আত্ম-গোপন না করে নিছক সত্য কথাটি তিনি বলে যান বলেই তার সুর এত প্রাণস্পর্শী হয়।”

সৃষ্টিনাথ মুগ্ধ হইল, এই বিদুষী মেয়েটি এমনি গভীর ভাবে কবিদের বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে! নিজেদের পারিবারিক চিত্রটিও চকিতে মনে জাগিল,—হাঁড়ি ঠেলা ও গৃহকর্ম্ম ছাড়া উঁচু কোনও কথা পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা ভাবে না, ভাব্‌তে চেষ্টাও করে না, জীবনটাও তাই বৈচিত্র্যহীন বোধ হয়। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলিল, “আশ্চর্য্য এমন ভাবে আপনি ভাবেন! পাড়াগেঁয়ে সমাজের মেয়েরা এমন কথা কল্পনাও কর্ত্তে পারে না। নিজেদের ঘরকন্নার বাইরে যে একটা সবুজ জগৎ আছে তাদের ধারণায় এ আসে না।”

স্মৃতি সুন্দর মুখে একটু হাসিয়া বলিল, "সেটা ঠিক তাদের দোষ ত নয়। মাটিতে শস্যোৎপাদন ক্ষমতা আছেই, কিন্তু উপযুক্ত আবাদও চাই ত। দুঃখিত হবেন না সৃষ্টিবাবু, এখনো আপনাদের সমাজ মেয়েদের অন্তঃপুরের কারাপ্রাচীরে ঘিরে রাখ্‌তে চায়। আলো থেকে চিরদিন যারা বঞ্চিত আলোর বর্ণনা তারা কি করে কর্ব্বে? পাখীকে চিরদিন খাঁচায় পূরে রাখ্‌লে গানটুকু অবধি সে ভুলে যায়। হিন্দুসমাজের দু'চারিটি মেয়ে যাঁরা সাহিত্যসেবা করেন আত্মীয়দের কাছে তাঁদের কারু কারু প্রথমে লাঞ্ছনাও ভোগ কর্ত্তে হয়েছে। অবশ্য সে দিন ঘুচে যাচ্ছে।"

সৃষ্টিনাথের সুগৌর মুখ কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু এই কঠোর সত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার যো ছিল না। সৃষ্টির এ ভাবটুকু তীক্ষ্ণদৃষ্টি স্মৃতির নজর এড়াইল না, সে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "এক সমাজের সবই খারাপ আর এক সমাজের সবই ভাল এমন সঙ্কীর্ণ মত আমার নয়, তবে সমাজরূপ মহাতরুতে সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারের যে আগাছা আছে, গাছটিকে সুন্দর ও সবল কর্ব্বার জন্য সকলের তাহা দূর কর্ত্তে প্রাণপণ চেষ্টা করা দরকার। ভাল যা তা সব স্থানে, সব সময়ে, সব সমাজেই ভাল। আপনার কি মত?"

এই অপক্ষপাত উক্তিতে সৃষ্টি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল, "আপনার সঙ্গে আমি একমত, যদিও এসব কথা তলিয়ে ভাব্‌বার সুযোগ ও অবসর পূর্ব্বে পাই নি। আপনার কাছে উপকৃত হলেম একথা স্বীকার কর্ত্তে আমি একটুও সঙ্কোচ

বোধ করি না।" কিরণ তাহার প্রতি একবার বঙ্কিম দৃষ্টি প্রেরণ করিল।

স্মৃতি বলিল, "সে আপনার অসম্ভব রকম বিনয়প্রকাশ।—যাক্। এখন আপনার কাছে একটি সাহায্য ভিক্ষা, কিরণদার কাছে শুনে থাকবেন আমরা ক'জন সাহিত্যিক বন্ধু মিলে একটি উচ্চ অঙ্গের মাসিক চালনা কর্ব্ব। সাহিত্যিক বন্ধু মানে সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক সুহৃদ্, তা তিনি যে জাতি ও বর্ণ হউক না কেন। বাইরের জগতের মত সাহিত্যেরও একটা বৃহৎ রাজ্য আছে এবং সেখানে স্ত্রী পুরুষের কোনও ব্যবধান নাই, কারণ সে এক মহাতীর্থ, এবং সমস্ত সাহিত্যসেবীই সেই তীর্থের সহ যাত্রী। আমাদের উদ্দেশ্য জগতে সত্য প্রচার করা, যে সত্য মানুষ চিরদিন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করে, এবং বিশ্বমানবমণ্ডলীর যাহা হিতকর। এইভাবে সমস্ত জগতে একটা সার্ব্বভৌমিক প্রীতি স্থাপিত হবে।...আপনাকে এই কাগজে নিয়মিত লিখ্‌তে হবে প্রাণের উপলব্ধির কথাগুলি। আশা করি আমার যাচ্ঞা ব্যর্থ হবে না।"

ক্ষণিকের জন্য লাজুক সৃষ্টিনাথ আপনাকে ভুলিয়া গেল। তাহার প্রাণ তখন কোন্ অনন্তে উধাও হইয়াছিল, যেখানে নিখিল ভুবনের সমস্ত প্রাণ একটি শৃঙ্খলে গাঁথা। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "নিশ্চয়, এই মহৎব্রত উদ্‌যাপন আমার জীবনের একটি লক্ষ্য বলে মনে কর্ব্ব।"

স্মৃতি প্রীত হইয়া বলিল, "অত্যন্ত সুখী হলেম। আমার

আরো দু'একটি সাহিত্যিক বন্ধু এখনি আস্‌বেন, তাঁদের সঙ্গেও আপনাকে পরিচিত কর্ব্ব।”

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অরুণিমা, নীহারিকা, মঞ্জুষা ও আরো দু'একটি তরুণীব আগমনে কক্ষটি কলকণ্ঠমুখর হইয়া উঠিল। স্মৃতি সকলের সহিত সৃষ্টিনাথকে পরিচিত করিয়া দিল। সৃষ্টির সঙ্কোচ তখন প্রায় কাটিয়া গিয়াছিল, ইহাদের সহিত পবিচয়ে সৃষ্টির বোধ হইল যেন সে এক নূতন জগতের সন্ধান পাইল।— মেয়েদের কাছে এমন অসঙ্কোচপূর্ণ ব্যবহাব লাভ জীবনে তাহার এই প্রথম। জগতের কত কথাই এরা জানে, কত কথাই ভাবে, কেমন সহজ সরল ভাবে পরকে আপন করিয়া লয়। এ সব সৃষ্টি যতই লক্ষ্য করিল ততই সে শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িল। তাহার সাহিত্যপ্রীতি ইহাদেব কোমল সংস্পর্শে মধুবতর হইয়া উঠিল। মেয়েরা এই অন্তর্দৃষ্টিশালী নম্রস্বভাব যুবকটির ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইল, এবং এই অল্পসময়েব পবিচয়েই তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিল।

সাহিত্যালোচনায় সময়টি মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল এবং যখন সন্ধ্যার ম্লানমাধুবী পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল তখন কিরণ বলিল, “সাহিত্যের এই অষ্টবজ্রসম্মিলন সঙ্গীতেব সুধাসিঞ্চনে মন্ত্রপূত করা একান্ত প্রয়োজন।”

উপস্থিত সভ্যগণ এই প্রস্তাব সাহ্লাদে অনুমোদন করিলে সকলের অনুরোধে অরুণিমাবেই গায়িকার সুউচ্চ আসনে আসীন হইতে হইল, তাহার পক্ষ হইতে কোনও আপত্তি টিঁকিল না।

কক্ষের একধারে বড় টেবিল হার্ম্মোনিয়াম ছিল, অরুণিমা আরক্তমুখে তাহার সাম্‌নে বসিয়া রিড চাপিয়া বেলো করিতে করিতে পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গিনীকে কি গাহিবে জিজ্ঞাসা করিলে স্মৃতি জানাইল সাহিত্য-সভায় তদুপযোগী গান গাওয়াই বিধেয়।

নীচের বাগানের ফুলগন্ধ বহিয়া তখন সাঁঝের মন্দ সমীর বহিতেছিল, তাহার স্পর্শে অরুণিমার কাজল-কালো কোঁকড়ান চুলের কয়েকটি তাহার নিখুঁত মুখখানির উপর উড়িয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার ঢেউএর মত অরুণিমার শুভ্র আঙ্গুলগুলি রিডের উপর নাচিতে লাগিল, তারপর সুরের তরঙ্গে সান্ধ্যমাধুরীপূর্ণ কক্ষটী ভরিয়া উঠিল। সে গাহিল—

"প্রাণে যখন সুরের হাওয়া বয়
তখন নিখিল ওঠে আলোয় নেয়ে
তুফান খেলে হৃদয় ময়।···
নিঝুম রেতের ঘুমের মোহ রয় না তখন আর,
ছন্দ-শিশু হাত ঝাড়িয়ে ডাকে গো বার বার
সোণার পাখা দু'টি মেলে
অসীমে প্রাণ যায় যে চলে,
চির জাগরণের মাঝে তন্দ্রা তখন পায় বিলয়।"···

এ যে সেই অচেনা গায়িকার স্বর যাহা সৃষ্টিনাথের বুকে সেদিনকার বাদল রাতে মোহকর আবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল,—তেমনি করুণ, তেমনি কোমল, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী! সৃষ্টির বুকের সমস্ত তারগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিয়া বাজিয়া উঠিল! আবার

সেই হারানো আবেশে সৃষ্টির সারা প্রাণ ভরিয়া উঠিল, ঘুমন্ত প্রাণে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল!…

গান থামিল, কিন্তু সৃষ্টির আবেশ-বিভোর চিত্ত হইতে মোহময় রেশটুকু মুছিল না। বিদায়ের শিষ্টতা কোনও প্রকারে রক্ষা করিয়া কিরণের সহিত মেসে ফিরিবার সময় আলোকোজ্জ্বল নগরীর পথে সৃষ্টি কতবার মোটর চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল,—এমনই অন্যমনস্ক হইয়াছিল সে! মেসে ফিরিয়া কিরণ সৃষ্টির সহিত সরাসর তাহার তেতলার ঘরটিতে যাইয়া বসিল এবং বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "বাঙ্গালীর মস্ত একটা অপবাদ আজ দূর হল, সে জন্য সমাজের তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"

সৃষ্টি একটা বাক্সের উপর বসিয়া জুতার দিকে চাহিয়া ফোল্ডিং-কপ্ সার্টের বোতামগুলি খুলিতেছিল, বলিল, "কি রকম?"

সোণার ঘড়িটি রুমালে মুছিয়া কিরণ বলিল, "বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ। আজ সুন্দর আলাপ করেছ, এতটা আমি আশা করি নি, যে লাজুক তুমি। আচ্ছা এর ভেতর insight (অন্তর্দৃষ্টি) কার বেশী মনে হল,—স্মৃতি, অরুণিমা না নীহারিকার?"

জুতার লেশ সম্পূর্ণ খুলিয়া সৃষ্টি বলিল, "স্মৃতির, গভীরভাবে তিনি পড়েন ও ভাবেন।"

"Partiality (পক্ষপাতিতা) হচ্ছে তোমার, আমার মনে হয় অরুণিমার ভাবনাগুলি বেশী দার্শনিক, কিন্তু কথায় সে তা প্রকাশ

করে না, আপনি প্রকাশ হয় তার চোখের গভীর দৃষ্টিতে। ওকি হাতের বোতাম আর জুতার সব লেশ খুলে ফেল্লে। কি হচ্ছে ও!"

সৃষ্টি চমকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বলিল, "বাড়ীর কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ট্রেণ পেলে হয়। বেজায় রাত করে ফেল্লে।"

"কৈ তোমার ত তাড়াহুড়ো কিছু ছিল না, বরং—"

"সে যে শিষ্টতা বিরুদ্ধ হত। অথচ আজ না গেলেও নয়।"

"এত দিনই ত গেল, আর একটা দিন না হয় বিরহটা সয়ে থাক। আচ্ছা তোমার insightও ত মেয়েমহলে সবাই মেনে নিয়েছে। আমি এবার কিছু পরখ করি, গায়িকাটিকে চিন্তে পেরেছ?"

চস্‌মার ভিতর দিয়া বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া সৃষ্টি বলিল, "কি বকম? তোমার পিস্‌তুতো বোনেব বন্ধু।"

"সে ত সবাই জানে, অন্তর্দৃষ্টির পবিচয় তাতে নেই। বলি সুবের ভেতর দিয়ে কোনও সন্ধান পেলে—হারিয়ে যাওয়া কিছুর?"

কপালের রেখাগুলি কুঞ্চিত করিয়া সৃষ্টি বলিল, "কৈ আমার কিছু ত হারায় নি যে তার সন্ধান পাব। তোমার ও হেঁয়ালি আমি বুঝি না।" কিন্তু জিজ্ঞাসু নয়নে কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "সেই বাদল রাতে ঝড়ো হাওয়ার

কথা মনে পড়ে? যে অচিন্ গায়িকার সুরের হাওয়ায় তোমার তারগুলোতে ঝঙ্কার উঠেছিল!"

সৃষ্টিনাথ এমনি কিছু ভাবিতেছিল, চুপ করিয়া স্মৃতির দেশ-খানি খুঁজিতে লাগিল।

কিরণ তেম্নি ভাবে বলিয়া গেল, "সেই হারানোর সন্ধান আজ তোমাকে দিলেম। ঐ অচিন্ গায়িকাই অরুণিমা। এতদিন বলিনি, কি জানি কি খেয়াল ঢুকেছিল মাথায়, জান ত বরাবর খেয়ালেই আমি চলি। গানের ছায়া ও কায়া বিভিন্ন ও সম্মিলিত ভাবে মানুষের মনে কি রকম effect (ফল) জন্মায় তা study (পর্য্যবেক্ষণ) কর্ব্বার জন্য তোমাকেও জান্‌তে দেই নি। এ একটা original research (মৌলিক গবেষণা), এবং এ নিয়ে একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখ্‌বার ইচ্ছা আচ্ছা থার্ড ক্লাস এম, এরা পি, আর, এস্ বৃত্তির জন্য theis (রচনা) দিতে পারে না?"

সৃষ্টির শরীরের রক্ত এমনভাবে বহিতে লাগিল স্বাভাবিক নহে। মুখের আরক্তিম ভাবটা রুমালের ঘর্ষণের ফল প্রতিপন্ন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কম্পিতস্বরে সৃষ্টি বলিল, "অদ্ভুত মানুষ তুমি! এ ভাবে মেয়েদের কাছে আমাকে খেলো করা ভারি অন্যায়। আর কখনো তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।"

কিরণ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "সত্যি ভাই ওরা কেউ জানে না, এবং এ ভাবে তোমাকে ডাকেও নি। অরুণিমার গান তুমি কোনও দিন শুনেছিলে তাকেও জান্‌তে দেই নি। যাই ভাব,

তোমাকে আমি খেলো চোখে দেখি না। তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই, তুমি আমি ছাড়া এ সব আর কেউ জানে না— তোমাকে আমি জানি, আর তুমি বিবাহিত, নৈলে তাদের সঙ্গে তোমাকে পরিচিত কর্ত্তাম না। ওরা সবাই সম্ভ্রান্ত। অরুণিমার সঙ্গে introduced হয়েছি আজ অল্পদিন,—ভারি সুন্দর গায় কিন্তু, লেখাপড়াও জানে চমৎকার।"

সৃষ্টি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল হাজার এলোমেলো চিন্তা তাহার মনের ভিতর ঘোরা ফিরা করিতে লাগিল। একটু পরে সহসা দাঁড়াইয়া বারান্দার রেলিংএর ধারে যাইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "বামুনঠাকুর ভাত বাড়ো, আমার ট্রেণের সময় হল।"

কিরণ ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া বিস্মিতভাবে বলিল, "আজই যাচ্ছ?"

বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে সৃষ্টি নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে আজই সে রওনা হইবে।

৬

মা ও আত্মীয়দের আশীষ-কামনার ভিতর গৃহে ফিরিয়া সৃষ্টির তরঙ্গায়িত মন একটু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সারাটি পথ সীমাহারা চিন্তায় তাহার মন বড়ই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পথে সমস্ত ব্যাপারটা খতাইয়া কিরণকে তাহার এই চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু ভাবিয়া মনটা তাহার উপর অপ্রসন্ন হইয়াছিল, তবু সে চিন্তার জাল মাকড়সার মত নিজেকে ঘিরিয়া বুনাইয়াছে।

রাত্রিতে নিজের নির্জ্জন ঘরখানির শয্যায় অবসন্ন দেহ এলাইয়া শূন্য দৃষ্টি একটা খোলা বহির পাতায় বুলাইতে বুলাইতে যতই সৃষ্টি সুরুচির নীরব সেবা অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার প্রতি আকর্ষণের সহিত নিজের উপর একটা ধিকার জাগিয়া উঠিল। অবসন্ন মন সহজেই অভিভূত হয়, তাই পত্নীর নীরব সেবাগুলি আজ তাহার নজর এড়াইল না।

সৃষ্টি যে জিনিস যেমনভাবে ভালবাসে তাহা ঠিক তেমনিভাবেই ঘরে সাজান হইয়াছে। কাচের আলমারি, কাচের পুতুল-এবং চেয়ার, টেবিলগুলি ঝাড়িয়া-মুছিয়া, অতি সাধারণ আসবাবে ঘর খানি গুছাইয়া তাহার প্রীতিকর করিবার অন্তর-ভরা প্রয়াস সৃষ্টি ধরিয়া ফেলিল। ঘরের পুরাতন ছবিগুলি যথাসম্ভব সুন্দরভাবে দেওয়ালে সাজান। ফুলতোলা কার্পেটে ঢাকা টেবিলখানির উপর জলপূর্ণ কাচের গ্লাসে গোলাপ ও পাতাবাহারের তোড়া একধারে একটি আয়না। একটা কাচের প্লেটে কতকগুলি এলাচ, লবঙ্গ, সুপারির কুচি। বালিসের কাছে কতকগুলি যুঁই, চাঁপা, সন্ধ্যা মালতী। সে বুঝিল এ সব তাহারই অর্চ্চনার উপকরণ!…

পত্নীর নীরব সেবা এমন করিয়া বুঝিতে সে আর চেষ্টা করে নাই আজ তাহার চিন্তাশ্রান্ত দৃষ্টি আঁধার প্রান্তরে ক্ষীণ আলোকরশ্মির সন্ধানরত পথহারা পথিকের মতই দুর্ব্বল হৃদয়ে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছিল। আত্মদৃষ্টিবলে সে বুঝিয়াছিল যে, তাহার রঙ্গিন-নেশায় মাতাল মন বেপথুমান হইতেছিল, তাই

পাকা মাঝির মত প্রথমেই তাহার চোখ পড়িল শুকতারাটির দিকে।...

তরুণী পত্নী ঘরে আসিয়া সাবধানে দুয়ার বন্ধ করিয়া তাহার পায়ে প্রণাম করিতেই তাহার অবাধ্য চোখের দু'টি ফোঁটার উষ্ণ স্পর্শে চমকিত হইয়া সৃষ্টিনাথ সহসা তাহাকে দু'টি বাহুর পাশে বাঁধিয়া ফেলিল। সুরুচির গণ্ড বহিয়া মুক্তার ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, স্বামীর অযাচিত স্নেহলাভের প্রথম সৌভাগ্যে।

সৃষ্টি দেখিল, দেখিয়া বুঝিল। পত্নীর হাতদু'টি সাদরে ধরিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিল, "সুরুচি, তোমার ন্যায্য অধিকার থেকে আমি এতদিন তোমায় বঞ্চিত রেখেছি, এতদিন তোমায় চিনতে পারি নি, সে চেষ্টাও বুঝি করি নি,—আমায় ক্ষমা কর।"

এত আদরে সুরুচি পারুলের শেখান কথা ভুলিয়া গেল, প্রিয়র বুকের কাছে নারী যে তার জগৎ-সংসার ভুলিয়া যায়। সে ক্ষণিকের জন্য চক্ষু বুজিয়া স্বামীর উষ্ণস্পর্শটুকু অনুভব করিয়া লইয়া সিক্তনেত্রে বলিল, "যতটুকু আমায় দিয়েছিলে আমি যে তারও অনুপযুক্ত। দয়া করে পায়ের তলায় আমায় স্থান দিও, তার চেয়ে বেশী কিছু চাইতে আমার ভরসা হয় না।"

সৃষ্টি সস্নেহে পত্নীর মুখখানি দু'হাতে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এত কাছে ছিলে তুমি তবু চিন্‌তে পারি নি! আমি ধর্‌তে চাই নি তাই বুঝি তুমিও ধরা দাও নাই!"

সুরুচি নীরবে স্বামীর বুকের মাঝে মাথাটি লুকাইয়া রহিল।

তাহার ছোট বুকটুকুর ভিতর তখন সমুদ্রমন্থন চলিয়াছিল, আর সেই মন্থনে উঠিতেছিল যুগযুগান্তের সুধা।...

আকাশের ফুলবাগানটিতে তখন হাজার ফুল ফুটিয়াছিল। একটা পাখী তাহার ঈপ্সিতকে কাছে পাইয়া বিরহের ব্যথাগুলি তাহাকে বুঝাইতে যাইয়া দূর কাননটি কণ্ঠমুখর করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ক্ষীণস্বর গৃহমধ্যে ভাসিয়া আসিল। তাহা হইতেও ক্ষীণস্বরে সুরুচি বলিল, "আমায় অনুপযুক্ত বলে ক্ষমা করো।" আরো কত কথা তাহার বুকের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল, কিন্তু তাহার লজ্জারুদ্ধ কণ্ঠ তাহা কহিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

সৃষ্টি তাহাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া কহিল, "আরও কাছে—আরও কাছে এসো সুরু। কি এক আবেশ যেন আমাকে নূতন দেশে টেনে নিতে চায়, আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়।"

সুরুচি ভীত হইয়া স্বামীকে ধরিয়া প্রায় কাঁদিয়া কহিল, "কি হয়েছে তোমার? পরীক্ষার খাটুনিতে তোমার শরীর ভেঙ্গে গেছে। আর কথা কয়ো না, ঘুমাও, আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দি।"

সৃষ্টি অবসন্ন কণ্ঠে বলিল, "না, বুকের কাছ থেকে যেও না।" তারপর সহসা তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল, "গাইতে জান সুরু?"

সুরুচি মলিনমুখে কহিল, "সে জানে না।"

মিনতিভরা স্বরে সৃষ্টি কহিল, "শেখ, তুমি শেখ। বল শিখ্‌বে তুমি?"

সুরুচি স্বামীর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া বলিল, "চেষ্টা কর্ব্ব যদি তুমি চাও।"

যেন এই উত্তরটির জন্যই সৃষ্টি উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি চাই, আমি চাই সুরু। তোমার সুরের হাওয়ায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত মনটা ভরিয়ে দিও, যেন অন্য সুরে আমার মন পাগল হতে না পারে। কেন এমন হয় বল্‌তে পার?" বলিয়া শিশুর মত সৃষ্টি উত্তরের আশায় পত্নীর পানে চাহিয়া রহিল।

স্বামীর চুলের ভিতর আঙ্গুল চালনা করিতে করিতে কাতর-কণ্ঠে সুরুচি বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি এখন ঘুমাও। বেশী খাটুনিতেই মাথা কেমন বোধ কচ্ছ। সত্যি আমি শিখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। এখানে সবাই কি মনে কর্ব্বে, আর আমারও ভারি লজ্জা হয় তাই শিখ্‌তে পারি নি। তুমি যখন ভালবাস, সুবিধা পেলেই আমি শিখ্‌ব।"

সৃষ্টি প্রীত হইয়া তাহার হাতটি ধরিয়া বলিল, "বেশ হবে তা হলে। আর লেখাপড়াও তোমায় শিখ্‌তে হবে, নৈলে যে বুকের সবগুলো কথা গোপন থেকে যায়।" বলিয়া গভীর চিন্তায় আবার বিভোর হইয়া পড়িল।

সুরুচিও নিজের নির্গুণতার বিষয় খতাইয়া ধিক্কারে অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এই সর্ব্বগুণশালী স্বামীটিকে সুখী করিবার মত কোনও গুণই ত তাহার নাই। কেন ভগবান দেবতুল্য স্বামীটির উপযুক্ত করিয়া তাহাকে গড়েন নাই?...

নীরব রাতে, নীরব কক্ষটির ভিতর, দু'টি প্রাণী নীরবে ভিন্ন চিন্তার সূত্র বুনিতে লাগিল। কতকগুলি তারা আকাশে মলিন হইয়া গেল, কতকগুলি নূতন তারা নূতন প্রভায় ফুটিয়া উঠিল,

নৈশ সমীর ক্রমে শীতল হইয়া আসিল। একটা ঘুঘু মাঝে মাঝে উদাস কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছিল। রাত্রিশেষের শীতল মলয় স্পর্শে দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে পাখীর কলকণ্ঠে যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া সৃষ্টি দেখিল, তাহার পা দু'টি বুকের মাঝে লইয়া সুরুচি নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, অশ্রুর দাগ তাহার গণ্ড হইতে তখনো মুছিয়া যায় নাই, ভোরের নির্ম্মল আভা তাহার মুখখানি কেমন মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টি কিছুক্ষণ অতৃপ্তনয়নে সেই মাধুরীটুকু দেখিয়া লইল, বুঝিবা একটু অনুশোচনা হইল এতদিন ইহাকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া কত ব্যথাই না সে দু'জনার চারিপাশে গড়াইয়া তুলিয়াছে।

অধর পুষ্পপুটে একটি উষ্ণ কোমল স্পর্শে নয়ন মেলিয়া সুরুচি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর শ্লথবসন সংযত কবিতে করিতে প্রভাতের প্রথম আলোর চেয়েও সুন্দব সলাজদৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল। রজনীর তৃপ্তিটুকু তখনো তাহার সারা প্রাণ মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর পায়ে প্রণাম করিয়া আবার সেই মুখপানে সলাজ নয়নে চাহিয়া ধীরে ধীরে সুরুচি গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল। সৃষ্টির প্রাণটিও তখন ভোরের হাসিটির মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।—

দুপুর বেলা সৃষ্টি আহারে বসিলে বৃদ্ধা মা কাছে বসিয়া তাহার আহার দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাব আদেশ মত দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা সুরুচি পরিবেশন করিতে লাগিল। সৃষ্টি মাথা হেঁট করিয়া খাইতে লাগিল। এক একবার দু'জনার চোরা চাহনি বিনিময়

হওয়ায় উভয়েই রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। সংসারের খুঁটিনাটি নানা কথার পর সহসা মাতা বলিলেন, "তুই বাড়ীতে বেশী আসিস্ না, পারুল বলে তুই নাকি পর হয়ে যাচ্ছিস্। আচ্ছা ঐ যে সমাজ না কি আছে, যাতে মেয়েরা সব জুতো পরে পুরুষের হাতে ধরে বেড়ায়, সে কি তোর মেসের কাছে?"

মায়ের কথার ভঙ্গীতে সৃষ্টি হাসিয়া বলিল, "দুর সেখানে আমি কখনো যাই নি, কলেজ ও পরীক্ষার পড়া করে এক মিনিট সময় থাক্‌লে ত।"

মাতা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, ওদিকে যেও-টেও না। পাড়াগেঁয়ে লোকের ও সব সহুরে মেয়েদের সঙ্গে মিশ্‌তে নেই। ঢেঙ্গা মেয়ে সব পুরুষের সঙ্গে মেশে, কি বেহায়াপনা—ছেঃ! আমাদের কালে সোয়ামীর সাথেও দিনের বেলা কথা কইতে লজ্জায় মাথা কাটা যেত। পারুল বলে তুই পর হয়ে যাবি, ভয়ে বৌকে তোর কাছে যেতে দেই না,—দেখ্‌লি আক্কেলটা।" বলিয়া গালে হাত দিলেন।

সুরুচি রাঙ্গা হইয়া রান্নাঘরের কোণায় লুকাইল। সৃষ্টি বলিল, "ও একটা পাগল।" মাতা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সবাই ত আর ওর মত বেহায়া নয়। কি অনাছিষ্টি, শাশুড়ীর কাছে বৌ কিনা দিনরাত ভাতারের সাথে ফিস্ ফিস্ কর্ব্বে। ঘেন্না!" বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন।

সৃষ্টি নীরবে আহার করিতে লাগিল। মাতা বলিতে লাগিলেন, "আমরাও ত এককালে বৌ ছিলেম। দিনে দুপুরে থাক্, রাত্তিরে

বাড়ীর সবাই ঘুমুলে, তবে চোরের মত বৌরা সোয়ামীর ঘরে ঢুকত, কত ভয়, পাছে বাড়ীর কেউ দেখে। ছেলেরাও ছিল তখন বাপ মা গত প্রাণ। আর এখনকার ছেলেরা বিদেশে চাকরী হতে না হতে অম্নি বৌকে হাত ধরে নিয়ে যায়।"

একটা মাছ খাইতে খাইতে গলায় কাঁটা আটকাইয়া সৃষ্টির চোখে জল আসিয়া পড়ায় মাতা ষাট্ ষাট্ করিয়া বলিলেন, "ক'টা শুক্নো ভাত গিলে ফেল বাছা, আর বল বেড়ালের পায়ে পড়ি, কাঁটা সরে যাবে। পাড়াগেঁয়ে তন্তর মন্তর সব প্রত্যক্ষ, তোরা ত ইংরিজি পড়ে এ সব বিশ্বাস কর্ত্তে চাস্ না।" তার পর এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, "পারুলের কথা শুনেছিস্? পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে। সোয়ামী এসেছে তার সাম্নে 'হারমনিয়ম' বাজিয়ে গান করে, সন্ধ্যার সময় তার সাথে খোলা বাগানে বেড়ায়, আর হেসে হেসে এ ওর গায়ে পড়ে। মোক্ষদা, ক্ষেমাঙ্করী, এলোকেশী এরা সবাই দেখেচে। হলই বা ওর সোয়ামী হাকিম, তাই বলে কি পাঁচজনকে মেনে চল্‌বি না? তুইও ত একটা হাকিম টাকিম হবি, তা বলে তুই কি অমন কর্ব্বি, না বৌ অমন কর্ব্বে? মেয়েদের ইংরিজি পড়লে লাজ লজ্জা সব যায়। ক'দিন বৌমার কাছে বই টই নিয়ে এসেছিল, আমি বলে দিয়েছি বাপু ওসব বিবিয়ানায় আমাদের কাজ নেই।"

সৃষ্টি খুসী হইতে পারিল না, বলিল, "লেখাপড়া শেখাটা দোষ কি মা। সেকেলে যুগ কি আছে? সহরে আজকাল কত মেয়েরা লেখাপড়া করে পাশ করে, তাতে বরং তারা সভ্যই হয়, কার সঙ্গে

কি ভাবে চলা উচিত সে জ্ঞান জন্মে। অন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে পৃথিবীর সব জান্‌বার ভাব্‌বার শক্তি হওয়াটা কি ভাল নয় ?"

মাতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কি হবে ও সব জেনে ? হিন্দুর মেয়ে ঘরের কাজ-কর্ম্ম কর্ব্বে, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা কর্‌বে, ঘরের আর পাঁচজনের তত্ত্বতালাপি কর্ব্বে, দেব দ্বিজে ভক্তিমতী হবে,—তার বাড়া আর কিছুর দরকার নেই। আমরা ত লেখাপড়া জানি না, তাই সংসারে এ শৃঙ্খলা।"

মায়ের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহার মজ্জাগত সেকেলে ভাব দূর করা সম্ভবপর হইবে না জানিয়া সৃষ্টি নীরবে আহার সারিয়া উঠিল। নিজের ঘরে বিছানায় একটা বহি লইয়া পড়িয়া মাতার মতের বিরুদ্ধে পত্নীকে গড়িয়া তুলিবার ফন্দী ভাবিয়া সৃষ্টি হয়রাণ হইয়া পড়িল। এই অলস মধ্যাহ্নটুকু পত্নীর সহিত সুখ আলাপনে কাটাইবার আশায় নিরাশ হইয়া সৃষ্টি ক্ষুণ্ণমনে অগত্যা নিদ্রার আরাধনা করিতেছিল, কিন্তু নিদ্রার চেয়েও মধুরতর কিছুর আশায় সে ক্ষণে ক্ষণে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। পাড়াগেঁয়ে সমাজটার বিরুদ্ধে তাহার মন আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল। ভাবিয়া ভাবিয়া ক্লান্ত মনে সৃষ্টির একটুখানি তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ পারুলের ডাকে তাহার তন্দ্রা দূর হইল। সে চাহিয়া দেখিল, ঘরের ভিতর পারুল ও সুরুচির এক প্রকার ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল, "ব্যাপার কি পারুল ? মা এখুনি এসে পড়বেন।"

পারুল বলিল, "বুড়োদের যদি একটু আক্কেল থাকে, নিজেদের সব কথা ভুলে যাবার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা যদি আর কারো হয়।

কি সঙ্কীর্ণ ভাব এদের, এম্নি করে ছেলেকে ধরে রাখ্‌তে চায়, কিন্তু ফল যে তাতে হয় বিপরীত, তা তাদের সহজবুদ্ধিতে আসে না। ভয় নেই, ছুতো করে জেঠাইমাকে আমি ও পাড়ায় পাঠিয়ে দিয়েছি। আঃ তুমিও আচ্ছা লোক বৌদি, লজ্জায় মরে যান, আবার কেমন ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে, কি লজ্জা রে!"

সুরুচি পারুলের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। তাহাকে খাটেব গোড়ায় টানিয়া আনিয়া পারুল বলিল, "ভারি অন্যায় তোমার সৃষ্টিদা, এ ভাবে একটা লোককে অবহেলা করা। সবার ভেতর যে নাবায়ণ আছে, এবং মানুষকে অবহেলা কল্লে সেই নারায়ণকেই কবা হয়, লেখাপড়া শিখেও তোমরা ভুলে যাও।

সৃষ্টি হাসিয়া বলিল, "কি অবহেলা কর্‌লেম। মাতামাতি কবে যদি পরীক্ষায় ফেল কর্ত্তাম তাতে কি কোনও পক্ষের পৌরুষ বাড়ত।"

পারুল্‌ রাগিয়া বলিল, "আব পরীক্ষার দোহাই দিতে হবে না। একটা কর্ত্তব্য রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে অন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা কোনও শাস্ত্রেই লেখা নেই। একটা চিঠি দিয়েও বেচারার খোঁজ নেওয়া হয় না, ও যেন সুখদুঃখ বোধহীন একটা পাথরের ঢিপি। মেয়েদের কি অবজ্ঞার চোখেই তোমরা দেখ! যদি এতই অপছন্দ, তবে সাহস করে সে কথা বিয়ের আগেই বল্লে হত,—প্রাণ নিয়ে ত পুতুল খেলা চলে না।"

এই বিদুষী জ্ঞাতি কন্যাটিকে সৃষ্টি স্নেহের চোখে দেখিত।

আবাল্য সংস্কারের দরুণ যদিও স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সম্পূর্ণ পক্ষে সে এতদিন ছিল না, তবুও স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা এবং সেই শিক্ষা মেয়েদের অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ের চেয়ে কতটা উঁচু স্তরে তুলিয়া দেয় তাহা সে বুঝিত।

সৃষ্টি বলিল, "বিবাহ দু'টি হৃদয়ের পরিচয়, কিন্তু এক সুরে বাঁধা না হলে কি সে পরিচয় কখনো সুখের হতে পারে?"

"সে চেষ্টা করেছ কোনও দিন? হিন্দুর মেয়ে কাঁচামাটির পুতুল, স্বামী যে ভাবে খুসী গড়ে নিতে পারে। আমিও ত স্কুল কলেজে পড়িনি, কিন্তু—"

সৃষ্টি হাসিয়া বলিল, "সুকুমারবাবুর মত পাকা কুমার ত সবাই নয়। ওর নামেও সু, কাজেও তাই।"

"নাও নাও, আর ঠাট্টা কর্ত্তে হবে না। বেচারার চিঠিখানার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না, এত অবজ্ঞা! সাবিত্রীর তুলনাটা ত পদে পদে দাও কিন্তু সত্যবানের মত গুণবান্ হবার চেষ্টা ত কখনো তোমাদের দেখা যায় না। ঠাট্টা নয় সৃষ্টিদা, তোমার বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার হচ্ছে। লেখাপড়া শিখেও পাড়াগেঁয়ে হওয়া তোমার আদৌ সাজে না। নির্জীব বই পড়ে আত্মহারা হও, আর দেখ ত এ পাতা দু'টি, পৃথিবীর সমস্ত কাব্য যে এখানে লেখা আছে" বলিয়া সুরুচির ঘোম্‌টাখানি তাহার বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও খুলিয়া ধরিল।

চকিতে সেই আয়ত সজল চোখ দু'টির পানে চাহিয়া লইয়া সৃষ্টি বলিল, "কাল আপোষ হয়ে গেছে, দু'পক্ষই অনেক স্বার্থ ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

সুরুচি জোর করিয়া ঘোম্‌টা টানিয়া দিল, পারুল হাসিয়া বলিল, "সত্যি নাকি বৌদিদি ? ঐ চুপ। তুমিও কেমন জানি বৌদিদি, কনে বৌটি ত নও। আমি ত আমার দেওর, ননদের সাম্‌নে ওঁর সঙ্গে কথা বলি, তাস খেলি। সমবয়সী পাঁচজনে মিলে আমোদ করা উনি খুব পছন্দ করেন, বলেন ছোট ছোট ভাইবোন-গুলোকেও আড়াল করে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে করে ক্রমে একটা লুকোচুরি স্বভাব হয়ে যায়। এ চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়, তবে হ্যাঁ, গুরুজনের সম্মান রেখে চলা উচিত। আমারও একথা বেশ লাগে। তোমার কেমন লাগে সৃষ্টিদা ?"

"সুন্দর। সত্যি লুকোচুরি করে করে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়। যার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপন হয়ে যায় তার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তেও এমন 'গরুচুরি ভাব' বোধ হয় বাঙ্গ্‌লা দেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। পুরাকালে কিন্তু এমন ছিল না। ঘোম্‌টার প্রচলনের ইতিহাস জানিস্‌ ত ?"

"হাঁ। যে কোনও উদাব সভ্যদেশে মেয়েদেব ঘোম্‌টা আর জড়ভরত ভাব নেই।...তুমি ক'দিন আছ ত ? এ ক'টা দিন একটু একটু লেখাপড়া শেখাও না বৌকে।"

"বাপরে গাঁ শুদ্ধ ঢি ঢি পড়্‌বে।...লুকোচুরি করাটা আমার রীতিবিরুদ্ধ।"

"কিন্তু তা বলে কি কর্ব্বে ? দেখ আজীবন যাকে নিয়ে ঘর কর্ত্তে হবে তাকে ঠিক মনের মতটি করে না নিলে চিরদিন অযথা মনঃকষ্ট পোয়াতে হয়। তুমি গুণের পক্ষপাতী জানি, নিজেও

নিগুর্ণের মত কাজ করো না। এখনো শিখবার সময় আছে। ওঁরও অনেকটা তোমার ধাত, বাড়ীর সবাইও সেকেলে। প্রথম প্রথম আমাকেও কম হাঙ্গাম পোয়াতে হয় নি। ঐ একই বিশ্বাস, বৌ লেখাপড়া শিখলে, বিবিয়ানা কর্ব্বে; সংসার গোল্লায় যাবে; কিন্তু এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে চুপ করেছেন। চার শর ভেতর দু'শ তিনি বাড়ী পাঠিয়ে দেন, কাজেই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকার আর তেমন আপত্তি নেই।"

বাহিবে শাশুড়ীর সাড়া পাইয়া সুরুচি ত্বরিতে বাহিরে চলিয়া গেল। পারুল বলিল, "সেরেচে।"

সৃষ্টি সটান শুইয়া পড়িয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল। বাহিরে বৃদ্ধার কণ্ঠ শোনা গেল, "ওপাড়ার রামুর বৌয়ের কথা শুনে এলাম, তিন দিন হল রামু এসেচে, ঠেলে ঠুলেও বৌটাকে কেউ ওঘরে দিতে পারেনি। এমন লজ্জা, মান্যি গণ্যি।" কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি।···

একটা মাস সৃষ্টির সুখে কাটিল। এ ক'দিনে পত্নীর সহিত তাহার পরিচয় নিবিড় হইয়াছিল। পত্নীর হৃদয় ঢালা সেবা ও আত্মসমর্পণের ভাবটুকু তাহার বড়ই মধুর লাগিল।—সেই লজ্জানম্র ব্যবহারের ভিতর দিয়া সৃষ্টি যতটুকু পাইল তাহাতে নিজেকে পরম সুখী মনে করিল। রাত্রিতে তাহার বুকের মাঝে পত্নীর নিশ্চিন্ত সমর্পণ, দিনের বেলা গৃহকর্ম্মের মাঝে নীরব দৃষ্টিতে প্রেম জ্ঞাপন, সন্ধ্যায় তাহার জন্য গোপন-পুষ্প আহরণ সৃষ্টির চারিপাশে এক সোণার রাজ্য গড়িয়া তুলিল।·· অরুণিমার গানের সুর যে একটা

অশান্ত ভাব সে বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহা স্বপ্নের মতই বিলীন হইয়া গেল।

পারুল ও সুকুমারবাবু আসিয়া মাঝে মাঝে সময়টা মধুরতর করিয়া দিত, যদিও বৃদ্ধা মাঝে মাঝে এ সভায় আদর্শ লজ্জাবতী লতাদের লজ্জাশীলতার বিচিত্র উপাখ্যান করিয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ লজ্জাশীল করিবার প্রাণপাত প্রয়াস পাইতেন। মুখরা পারুলও তদুপযোগী পাল্টা উপাখ্যান শুনাইয়া জেঠাইমাটিকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত যে অবশেষে তাহাকে সমস্তটা দোষ কালের কাঁধে চাপাইয়া নীরব হইতে হইত। কিন্তু একটি ব্যাপারে বধূটির লজ্জাহীনতার আঁচ পাইয়া তিনি এমনি কতকগুলি উক্তি করিয়া গেলেন যাহা উভয় পক্ষেরই প্রীতিকর হইল না। সুরুচির বাপ পাড়াগেঁয়ে জমীদার, কাজেই প্রজা শাসন ও শোষণের বাইরের সবুজ জগৎটির খোঁজ বড় একটা রাখিতেন না। দীর্ঘদিনের পর কন্যা জামাতার মিলন হইয়াছে এমন সময়ও কন্যাকে বাড়ী লইবার জন্য তিনি পুত্র হেমশঙ্করকে লোক জন সহ পাঠাইলেন। গ্রাম্য জমীদার-বাটির দাম্ভিক চালচলন সৃষ্টির ভাল লাগিত না, তাই সে শ্বশুরগৃহে যাইত না, মাও জেদ করিতেন না, যদি ছেলে শ্বশুরের বিষয়বৈভব দৃষ্টে ঘরজামাই হইয়া পড়ে এই ভয়ে! জমীদার মহাশয় পুত্রকে বলিয়া দিয়াছিলেন, জামাতা আসিতে স্বীকৃত না হইলে মেয়েটিকেই লইয়া যাইতে। সৃষ্টির মাতা এরূপ লোক প্রেরণ অনেকবার উপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু এবার তিনি বধূ পাঠাইতে সর্ব্বান্তঃকরণে রাজী হইলেন। সৃষ্টি মায়ের বিবেচনায় অবাক্ হইল,

সুরুচি দুঃখিত হইল, এমন সুখ ফেলিয়া কেউ কি কোথাও যাইতে চায়, হোক্ সে বাপের বাড়ী। গোপনে দাদাটিকে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে যাহা যাহা বলিল, "দারাম দাদাটি অকপটে তাহা সৃষ্টির মাতাকে কহিল। ফলে চক্ষু তারকা দু'টি উল্টাইয়া সৃষ্টির মাতা এমন ভঙ্গিতে গালে হাত দিলেন যে অবাক্ হইবার মত এমন নির্ল্লজ্জতা তিনি জীবনে দেখেন নাই। লোক ফিরিয়া গেল সত্য কিন্তু সেদিনকার নারী-সম্মিলনীতে মাতা মোক্ষদাসুন্দরী, কামাখ্যাসুন্দরী, ক্ষেমদাসুন্দরী প্রভৃতি সুন্দরীরা এমন ভঙ্গীতে এমন কতকগুলি লজ্জাকর উক্তি করিয়া গেলেন, যাহা ভিন্ন দু'টি ঘর হইতে শুনিয়া সৃষ্টি ও সুরুচি সমভাবে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সুরুচির সুগভীর স্বামিপ্রেমের পরিচায়ক ঐ ঘটনাটুকু সৃষ্টিকে যেমন উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল, সেকেলে মাতার সঙ্কীর্ণতা তেমনি তাহাকে পীড়িত করিল। মাতৃভক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল, তাই নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা খতাইয়া দেখিয়াও সে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইল না, শুধু পীড়িত হইল। মায়ের দুর্ব্বলতা কোথায় বুঝিয়া সে নিজকে দমন করিয়া ফেলিল, এবং তাহা করিতে যাইয়া প্রাণের রঙ্গিন কল্পনাগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল। বাকী ক'টা দিন বড় দুঃখেই সৃষ্টি বাহিরে বাহিরে কাটাইল।

তাহাতে দুঃখিত হইলেন না। ভাবিলেন, ঠিক ওষুধ না পড়িলে আজকালকার বেহায়া ছেলেমেয়েগুলি শোধ্রায় না; এবং তাদের দৈনন্দিন বৈঠকেও ইহার সাক্ষ্যস্বরূপ হাজার দৃষ্টান্ত উক্ত হইল।

ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে কলিকাতার কোনও কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকের জন্য বিজ্ঞাপন দেখিয়া সৃষ্টিনাথ আবেদন করিয়া রাখিয়াছিল। নিয়োগ পত্র আসায় সৃষ্টি যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল বাড়ীর সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

মাতা খুসী হইয়া পাড়ায় এ শুভ সংবাদ দিতে গেলে মোক্ষদা, ক্ষেমদা প্রভৃতি দূরদৃষ্টিসম্পন্না প্রতিবেশিনীগণ প্রথমেই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এইবার সৃষ্টি বৌকে কলিকাতা লইয়া পারুলের মত বিবি করিয়া তুলিবে। তারপর বিদেশে ছেলে বৌ একসঙ্গে থাকার ফলে কোন্ পরিবারে কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহার অনেক অনেক দৃষ্টান্ত উক্ত হইল। শুনিয়া সৃষ্টির মায়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, এবং তিনি বাড়ী ফিরিয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই পুত্রকে জানাইয়া রাখিলেন যে, শ্বশুরের ভিটার সন্ধ্যাপ্রদীপ নিভাইয়া তাহার বিদেশে যাওয়া সম্ভবপর নয়, এবং চলচ্ছক্তিহীন শাশুড়ীকে একা ফেলিয়া বৌ কলিকাতা গেলেও সাতটি গাঁয়ে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে। সৃষ্টি নিজের গদ্যপূর্ণ ভবিষ্য দৃশ্য ও মেসের দুষ্পাচ্য আহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভাবিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিল।

এই শুভ সংবাদে পারুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া জেঠাইমাকে তল্পী তল্পা বাঁধিয়া লইতে বলায় তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "রাম, রাম, আমাদের কি কল্‌কাতা থাকা চলে। জাতের বিচার নেই, বাড়ীর নীচে দিয়ে ময়লার নর্দ্দমা, বিধবার বে হয়—ছেঃ!"

পারুল বলিল, "গঙ্গাস্নানের জন্য ত কত আগ্রহ ছিল তোমার। এমন সুযোগ হারাবে।" "এই আমার গঙ্গা, এই আমার কাশী। শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারি," বলিয়া সৃষ্টির মাতা যুক্তকর মাথায় ঠেকাইল।

"বেশ থাক!—পরে পস্তাবে জেঠাইমা, বলে দিচ্ছি," বলিয়া পারুল সুরুচির খোঁজে গেল। সুরুচি তখন রান্নাঘর নিকাতেছিল, ইচ্ছা করিয়াই সে সম্প্রতি কাজের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। পারুল সুরুচিকে বলিল, "আনন্দে দিশে হারা হয়েছ বুঝি বৌদি'। ক'টা বাজে খোঁজ রাখ? তারপর কবে যাওয়া হচ্ছে?"

সুরুচি নিবিষ্ট ভাবে কাজ করিতে করিতে বলিল, "কোথায়?"

"কোথায় আর, তীর্থে। নরদেবতার চাকুরী স্থলে।"

"বাঃ, আমি যাব কেন?"

"চাক্‌রী কর্ত্তে আর কেন? বিনি মাইনা,—খোরাকী মান-অভিমান। স্বামিসেবারূপ চাক্‌রী গো, যার জন্য এদ্দিন কেঁদে মর্‌ছিলে।"

"মা ত যাবেন না শুন্‌লেই ত।"

"নাই বা গেলেন, তোমার যেতে বাধা কি? বেচারার আজীবন মেসের ভাত খেয়ে কাট্‌ল, অনুগতকে একটু নেকনজরও কর্ত্তে হয় ত।"

সুরুচি নীরবে হাত ধুইতে লাগিল। পারুল বলিল, "সত্যি যাওয়া হবে না? বুঝেছি সব। আশ্চর্য্যি এই পাড়াগেঁয়ে বুড়োর

দল, আক্কেল বলে জিনিস যদি এদের থাকে। ফল ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি, তাকেও ভুগ্‌তে হবে।"

সুরুচি হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "কি যে বল তুমি।"

পারুল বলিল, "শক্ত টানে দড়ি ছিঁড়ে যায়, সে ছেঁড়েই। যাক্ ভেব না, আমিই তোমার হয়ে তত্ত্বতালাপিটা কর্ব্ব। ওঁব ছুটি ফুরিয়ে এল। কল্‌কাতায় আলিপুবে বদ্‌লী হয়েচেন, আজই আমরা যাচ্ছি।"

সুরুচি কাতব হইয়া বলিল, "আজই যাচ্ছ, এত শীগ্‌গিব। ভারি কষ্ট হবে তোমার জন্য। তোমাব মত দবদী হারিয়ে কি করে থাক্‌ব ?"

পারুল দুষ্টু হাসি হাসিয়া কহিল, "আদত দবদীব সঙ্গে এবাব পরিচয় হয়েচে, আব ভাবনা কি। আজই হোক্ দু'দিন বাদেই হোক্ যাবেই, তখন দেখা হবে। এখন যাই বৌদি', গিয়ে সব গোছাতে হবে।"

পারুলকে বিদায় দিতে সুরুচির চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

এইটিই ছিল তাহাব সুখের সুখী, দুঃখেব দুঃখী।

সৃষ্টির কলিকাতা যাইবার দিনও ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। এবারকার নিবিড় পরিচয়ের পর মিলনের মধুর আকাঙ্ক্ষাটা সৃষ্টির মনের কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা পূবণ করিতে গেলে মায়ের প্রাণে কত বড় আঘাত দিতে হয় বুঝিয়া মাতৃভক্ত সৃষ্টি সমস্ত সুখ আকাঙ্ক্ষা ঝাড়িয়া ফেলিল। বিদায়ের রাতে সুরুচির নীরব রোদন ও দীর্ঘশ্বাস তাহাকেও আকুল করিয়া

তুলিল। অফুরন্ত ব্যথার কথা কহিতে কহিতে বুকে বুকে বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল। অবশেষে যখন নিত্যকার মত ভোরের আলোর সাথে পাখীগুলি কলরব করিয়া উঠিল তখন আসন্ন বিচ্ছেদের সুস্পষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া উভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

মাকে প্রণাম করিয়া ও দুর্গা নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টি যখন যাত্রা করিল দু'টি সজল চোখ তখন দ্বারের আড়াল হইতে তাহাকে ব্যথিত দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সৃষ্টিও সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকুর জন্য চকিতে চারিদিক্ চাহিয়া লইল, এবং চাকরের মাথায় মোট চাপাইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। গৃহের সম্মুখস্থ গ্রাম্যপথের বাঁক ফিরিতে গাছের আড়াল দিয়া একবার ঘরের দিকে চাহিয়া যখন দেখিল দুটি' নয়ন তখনো তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, তখন সৃষ্টিনাথের দৃষ্টি সহসা ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল।

ঘন সন্নিবিষ্ট আম কাঁটাল-তাল-নারিকেল-জামরুল জলপাই গাছের ভিতর দিয়া মেঠো গ্রাম্যপথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া কাহারো ঘরের পেছন দিয়া, কাহারো বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, চলিয়াছে। দু'পাশে কোথাও বা দু'একটা বেত ও বাঁশের ঝোড়, আম্রবন, ঘেঁটু ফুল ও কালকাসন্দার ছড়াছড়ি। অপরিচিত কৃষাণ বালকের মেঠো গলায় গোষ্ঠ গান, কাঠঠোক্‌রা ও কাঠবিড়ালীর চঞ্চলভঙ্গী, রৌপ্যালঙ্কারশোভিতা স্বামিসৌভাগ্য-গর্ব্বিতা কৃষক বধুর জলাহরণ—সমস্তই যেন এবার তাহাকে বিপুল আকর্ষণে টানিতে লাগিল। গ্রামটি যে এত মিষ্টি এমন

করিয়া বুঝি সে আর বোঝে নাই। গৃহকর্ম্মরত অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্যবধূদের নির্ব্বাক্ ছবি কত স্মৃতিই তাহার মনে জাগাইতে লাগিল।...

ষ্টীমারেও রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া সৃষ্টি নীরবে দু'পাশের পল্লী-গৃহ ও গৃহস্থবধূদের চিত্র দেখিয়া আন্‌মনা হইয়া উঠিল। অবশেষে যখন নদীর জল লাল হইয়া ক্রমে নিকষ কালো হইয়া উঠিল, দূরের গ্রামে সন্ধ্যাবাতি জ্বলিয়া উঠিল, সৃষ্টির মনে তুলসীতলায় সন্ধ্যাবাতি হস্তে সুরুচির ভক্তিনত মূর্ত্তিখানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কল্যকার এম্নি সময় আর আজিকার এ সময়ের ভিতর কি নির্ম্মম ব্যবধান!···

কলিকাতায় পুরাতন মেসটিতে উঠিয়া সেদিন রাত্রিতেই সৃষ্টি মেসের সকলে ঘুমাইলে সুরুচিকে দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিয়া গেল। তাহার সমস্ত বুক ব্যথায় ছাপাইয়া উঠিতেছিল, তাহা যেন প্রিয়ার কাছে নিবেদন না করিয়া সে সোয়াস্তি পাইতেছিল না। প্রতি লাইনে প্রতি অক্ষরে সে কি করুণ আর্ত্তনাদ! চিঠি লিখিবার এমন ব্যথাভরা আগ্রহ তাহার জীবনে এই প্রথম।···

পরের দিনটাও সে একাকী নির্জ্জন খুঁজিয়া কাটাইল। এই কোলাহলপূর্ণ নগরী, বন্ধুদের সংসর্গ, কিছুই যেন তাহার বিরাট্ শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারিতেছিল না, তাহার সারা প্রাণ আকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল একটি লাজনত, স্বল্পভাষী, বিষণ্ণ মুখের জন্য।···

ওদিকেও আর একটি প্রাণী ঠিক এম্নি সময়ে শয্যায় পড়িয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিল,—সে সুরুচি। সে ব্যথা কি

মর্ম্মান্তিক, কি মধুর, তাহা সুধা ও বিষের কি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, তাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সন্ধান লাভের পর বিরহের আগুনে যাহারা পুড়িয়াছে তাহারাই শুধু বুঝিতে পারে।...

স্বামীকে বিদায় দিয়া সুরুচি নীরবে নিত্যকার গৃহকর্ম্ম সারিয়া যখন শয্যায় পড়িল বিশ্বের সমস্ত হাহাকার তখন তাহার বুকের ভিতর উথলিয়া উঠিল। আর আর বার স্বামীকে বিদায় দিয়া তাহার প্রাণ ত এমনি করিয়া ফুকারিয়া উঠে নাই, কিন্তু এবার স্বামী ত তাহার চোখে শুধুই উপাস্য নহে, আরও মধুরতর সম্বন্ধ যে তাহার সহিত স্থাপিত হইয়াছে—যাহার গুণে চাঁদের আলো সুন্দর, পাখীর ডাক সুন্দর, ফুলের হাসি সুন্দর, সমস্ত নিখিল বিশ্ব সুন্দর।

এমনি করিয়াই নীরবে ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া সুরুচি খালি স্বামীর স্বপ্নই দেখিল, যেন এই বিশ্বে সে আর তার স্বামী ছাড়া আর কেহ নাই, চারিদিকে অগণিত ফুল,—উপরে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি, নীচে নদীর কুলুতান, বিশ্বে পাখীর মাতামাতি,— বিশ্বপ্রকৃতি শুধু তাহার স্বামীর অর্চ্চনা করিতেছে।

৭

আবার সৃষ্টি নিজেকে নীরস কর্ত্তব্যের মাঝে ডুবাইয়া দিল। ইতিমধ্যে মেসের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আলোক কি একটা সরকারি কাজ লইয়া শিমলা চলিয়া গিয়াছে, কিরণ বাড়ী হইতে ফিরে নাই, আরও বন্ধুদের ভিতর অনেকেই কাজকর্ম্ম লইয়া

এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিটি কলেজ হইতে এ মেসও অনেকটা দূর, তাই সৃষ্টি এ মেস ছাড়িয়া হ্যারিসন রোডের একটা অফিসার মেসে চলিয়া গেল।

কলেজের আই, এ ও বি, এ ক্লাসে ইংরাজি পড়ান ও বাড়ীতে তদুপযোগী পাঠের ভিতর মনটা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল,—আর একটা চিত্তবিক্ষোভকারী নূতন নেশা তাহাকে পাইয়া বসিল, তাহা কাব্যচর্চ্চা ও কবিতা লেখা, তাহাতে অবসন্ন মনটা সজীব হইয়া উঠিত। অল্পদিনেই বিরহের কথায় একটা বাঁধান খাতার পাতাগুলি ভরিয়া উঠিল।

সুরুচির চিঠির ভিতর তাহার গভীর প্রেমের পরিচয় পাওয়া যাইত, যদিও উচ্ছৃঙ্খলতার লেশ তাহাতে থাকিত না। সৃষ্টি এখন তাহার গোপন সুরগুলি যেন বুঝিতে পারিত। অপব্যয় এবং অন্যান্য কারণে সৃষ্টির মাতা পুত্র ও বধূর চিঠি লেখালেখি প্রসন্ন চোখে দেখিতেন না, কাজেই সুরুচি স্বামীর ঘন ঘন উত্তরের অনুরোধ্ এবং নিজের স্বাভাবিক উন্মুখ ভাবের চারিপাশে সংযমের রেখা টানিতেছিল। তাই সৃষ্টি মাঝে মাঝে অভিমান ক্ষুণ্ণ হইত,—তাহার ইচ্ছা হইত পত্নীর প্রেমভরা চিঠির বন্যায় ভাসিয়া যাইতে। সে প্রতি পত্রে পত্নীকে লিখিত পিপাসু চাতককে দু'ফোঁটা জল দিতে কেন তাহার এত কার্পণ্য, বিদেশের মরুমাঝে ঐ পানীয়টুকুর জন্য সে যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরে। সুরুচি বুঝিত তাহার অন্তরও ত অনুক্ষণ এইরূপ পিপাসু, কিন্তু পল্লীবধূর যে সব দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয়।

সৃষ্টির ছোট বোন্ সুমতি ইতিমধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী আসিয়াছিল। অনেকের মত তাহার নামের সহিত প্রকৃতির কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। তাহার অনুদার ও পরশ্রীকাতর চিত্ত প্রথম হইতেই সুরুচির রূপগুণ ও সৌভাগ্যকে অত্যন্ত ঈর্ষার চোখে দেখিল। তাহার স্বামী দরিদ্র, মদ্যপ ও চরিত্রহীন,—আর সুরুচি ধনীকন্যা, উপযুক্ত স্বামীর স্ত্রী, এ ঈর্ষা তাহার সহিল না। তাহার শিক্ষা ও ধৈর্য্যের অভাব না থাকিলে হয়ত সে তাহার স্বামীকে গঠিত করিতে পারিত, সে চেষ্টা সে করে নাই, কিন্তু ভ্রাতৃবধূর অদৃষ্ট তাহারই সমতুল্য করিবার চেষ্টা সে করিল। সে প্রতিপদে সুরুচির খুঁত ধরিয়া তাহার প্রতি মা ও ভাইকে বিরূপ করিবার প্রয়াস পাইল। প্রতিদিন সে খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া মায়ের আদালতে নালিশ করিত, এবং বিচারক সরাসর বিচারে একতরফা ডিক্রী দিতে লাগিলেন। আসামীর যবানবন্দী ও সাফাই সাক্ষীর বালাই নাই, কাজেই বিচার যে হবচন্দ্র রাজার উপযুক্ত হইত তাহা বলাই বাহুল্য। বধূটি নির্ব্বাক হইয়া শুনিত, মাথা পাতিয়া দণ্ড গ্রহণ করিত, নীরবে অশ্রু মোচনেরও ক্ষমতা ছিল না, কারণ এ অভিনব আদালতে অশ্রুমোচন একটা গ্রহণযোগ্য অপরাধ, এবং তাহার শাস্তির দস্তুরমত বিধান আছে। গরুচুরি ও খুনী ডাকাতি মোকদ্দমার আসামীরাও নিম্ন ও সেসন আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করে, কিন্তু সুরুচি কোথাও আপিল করিত না, অন্তর্যামীর আদালতেও না,—শাশুড়ী যে তাহার গুরুর গুরু!...

মাসকাবারে জীবনের প্রথম রোজগারের টাকাগুলি পরম

তৃপ্তির সহিত মাতৃসেবার জন্য পাঠাইবার সময় হঠাৎ সৃষ্টির মনে কি জানি কেন একটা খেয়াল আসিল। তাহার মনে পড়িল, সুরুচি তাহার প্রথম দান একটা আধফোটা গোলাপ কি গভীর শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল।—দানের যে একটা সার্থকতা আছে, তৃপ্তি আছে, সেদিন সৃষ্টি তাহা অনুভব করিয়াছিল। আজও ইচ্ছা হইল দু'টি টাকা, খালি দু'টি টাকা তাহার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সুরুচিকে পাঠাইয়া দিতে। তাহা পাইয়া সুরুচির মুখের ঢল্‌ঢলে তৃপ্তির ভাবটুকু কল্পনায় দেখিয়া সৃষ্টি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কি ভাবে পাঠান সঙ্গত চিন্তা করিয়া অবশেষে চিঠির সহিত খামের ভিতর পূরিয়া পাঠানই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া সৃষ্টি রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া একটি কবিতা লিখিল।

চিঠির সহিত নোট দু'টি পিন দিয়া গাঁথিয়া যথাসময়ে তাহা ডাকে পাঠাইয়া সৃষ্টি ভারি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এবং কম্পিত বক্ষে পত্নীর উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে যদি স্ত্রীলোক হইত, স্বামীর কাছ হইতে এইরূপ প্রণয়োপহার পাইয়া সে কি উত্তর করিত ভাবিয়া লইয়া সেই মর্ম্মে আর একটি কবিতাও লিখিল।

চিঠিখানি যখন গ্রামের পিয়ন সুমতির হাতে দিয়া গেল, সুরুচি তখন রান্নাঘরে উনান গোড়ায় বসিয়া ভাতের হাঁড়ির মুখে সরা দিয়া ফেন গলাইতে গলাইতে স্বামীর কথা ভাবিতেছিল। একদিন এমনি সময় শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে স্বামী দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দু'টি হাত আটকা, মাথার ঘোমটা খসিয়া

গিয়াছিল, কি মধুর সঙ্কটে সে পড়িয়াছিল! তাহার অবস্থা দেখিয়া স্বামী হাসিয়া খালিপায়ে কাছে যাইয়া ঘোমটাটি যথাস্থানে রাখিবার ছুতায় আগুনের আভায় রঞ্জিত তাহার গাল দু'টিতে—সুরুচি লজ্জায় আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, হাঁড়িটা কাঁপিয়া খানিকটা গরম ফেন হাতে পড়িয়া গেল।

এমন সময়ে বাহিরে ননদের ঝঙ্কারে সে চমকিয়া উঠিল। সুমতি তাহার মাকে বলিতেছিল, "এখনি এমন, আর দিন ত পড়ে আছে। চাকরী হতে না হতে মাগকে লুকিয়ে টাকা পাঠান। কি ঘেন্না! কি কলি, খালি বৌ আর বৌ! বাপ্‌রে বাপ্ আবার ছড়াও লেখা হয়েছে, সেখানি হচ্ছে প্রণয়োপহার। শোনই না মা, তোমার ছেলে কেমন কবি হয়েচে। ভারতচন্দ্রকে ডিঙ্গিয়ে গেছে।"

মাতা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ছিষ্টি টাকা পাঠিয়েছে! বলিস্ কিলা, লুকিয়ে বৌকে টাকা!"

সুমতি ভঙ্গীমা করিয়া কহিল, "শুধু কি তাই,—আবার ছড়াও লিখেছে। লজ্জায় মরে যাই, মরে যাই। এ সব থিয়েটারী ঢং ত দাদা আগে জান্‌ত না, বৌয়ের কাছেই শিখেচে। ঘেন্না ঘেন্না! মা আছে, বোন্ আছে, তাদের চোখেও ত চিঠি পড়্‌তে পারে। আচ্ছা লিখবে ত সোয়াস্তি মত লেখ। ঐ ত তোমার জামাই, কেউ দেখবে বলে আমায় ত চিঠী লিখেই না। ন-মাসে ছ-মাসে যদি লেখে খালি মায়ের সেবা করা, ননদ দেওয়ের যত্ন-আত্তি কর এই সব,—শাশুড়ী দেখে গদগদ। আমার এক দেওর আজ

ক বছর বর্ম্মায় আছে তবু বৌ নেবার নামটি নেই। বলে, বৌ এনেছি সংসারের কাজের জন্য, পরিবার নেবার জন্য নয়। কাজেই বৌও হয়েচে তেম্নি। রাঁধরে, বাড়রে, ঘর নিকাও রে, বাসন ধোও রে, গরুর জাবনা কাটরে,—টু-শব্দটুকু নেই। নাই বা এল্-এ বি-এ, কর্ত্তব্যবোধ আছে ত। লুকিয়ে আবার বৌকে কিছু পাঠাবে? ছেঃ! এইত আমার কাপড় ছিঁড়ে নুড়ি হয়ে গেলেও তোমার জামাই ফিরে তাকায় না। বাপরে তা হলে কি শাশুড়ী রাখবে।·· তুমি নিতান্ত ভালো মানুষ, আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে দিচ্ছ। ·” অথচ ইতিপূর্ব্বে এই দেবরের রেঙ্গুনে বার্ম্মী লইয়া থাকিবার অপবাদে এবং স্বামীর উপার্জ্জনে অক্ষমতা লইয়া সুমতি কত না জটলা করিয়াছে।

সুরুচি সভয়ে বেড়ার আড়াল হইতে উঁকি দিয়াছিল। তাহা টের পাইয়া তাহাকে আরও অপদস্ত করিবার জন্য সুমতি সৃষ্টির চিঠিখানি অপূর্ব্ব ভঙ্গীমায় উচ্চস্বরে পড়িতে সুরু করিল। শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় সুরুচির মাটির সহিত মিলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। স্বামীর চিঠির এইরূপ অপমান সে বহুক্ষণ সহিতে পারিল না, এবং সহসা সে তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ একটি কার্য্য করিয়া ফেলিল। সে ঝড়ের মত আসিয়া হঠাৎ ননদের হাত হইতে চিঠিখানা ছিনাইয়া লইয়া চক্ষের নিমেষে অমন প্রিয় নিদর্শন কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সুমতি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর আগুন-লাগা বারুদ স্তূপের মত বাড়ী মাথায় করিয়া চীৎকার সুরু

করিল, "দেখলে মা তোমার বৌয়ের আস্পর্দা, আমায় এম্নি করে অপমান করলে! তোমার জামাই কি আমায় ভাত কাপড় দিতে অক্ষম যে তোমার গলগ্রহ হয়ে অপমান সইতে আমি এসেচি। আমায় ঠোনা মেরে চিঠি কেড়ে নেওয়া! রোজগারি ভাতারের মাগ বলে দু'দিনেই এত গরব। কিসের এত জোর শুনি? এক বৌ মরে পুরুষ দশবার বিয়ে করে, কিন্তু মা বোনের সম্পর্ক মুছে ফেলতে পারে না। এমন দজ্জাল বৌ যদি সায়েস্তা না কর আমি এ বাড়ীর জল স্পর্শ করব না।"

এইবার মাতা ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন, "বৌ, তোমার ত ভারি সাহস হয়েচে। আমার মেয়েকে ঠোনা মেরে চিঠি কেড়ে নেওয়া। মিট্‌মেটে ডান, আজই তোমার এমন সাহস।"

সুরুচির ইচ্ছা হইল কাঁদিয়া শাশুড়ীর পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয় কেন সে অমন করিয়াছিল। কিন্তু সোরগোলে মোক্ষদা, ক্ষেমঙ্করী প্রভৃতি গ্রাম্য সভানেত্রীগণের শুভাগমন হইয়াছিল, এবং এই সকল ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে বধূর কোনও কৈফিয়ৎ না লইয়াই সমস্ত দোষ তাহার কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইল। শুধু তাই নয়, সেই পরামর্শ সভায় স্থির হইল যে, পুত্র ও বধূর ঘন ঘন পত্রের আদান-প্রদান বন্ধ না করিলে ফলে প্রেমের সহিত বহু নোটের সম্প্রদান গোপনে চলিতে থাকিবে যাহার ফলে বৃদ্ধামাতাকে অবশেষে খরচের অভাবে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে।

মোক্ষদা স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলিয়াছেন, এবং সেকালে মেয়েমানুষের 'লেখাপড়া' নিষিদ্ধ ছিল। খামে বন্ধ করিয়া আজকালকার মেয়েরা ভাতারের নিকট যা পাঠায় তা শাশুড়ীর মৃত্যুবাণ।

সৃষ্টির মাতা ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখিলেন না, এবং উপযুক্ত কন্তার সহিত পরামর্শ করিয়া, দিব্বি কাটিয়া বৌয়ের চিঠি লিখা বারণ করিয়া দিলেন।

ওদিকে সৃষ্টির আবেগভরা প্রাণ কোনই সাড়া না পাইয়া অবশেষে অভিমান করিয়া বসিল। এতদিন পত্নী সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া বেশ ছিল; কিন্তু এখন তাহার উপর দাবী-দাওয়া করিতে আরম্ভ করিয়া ও পক্ষকে উদাসীন দেখিয়া তাহার বুক অভিমানে, ক্ষোভে চুরচুর হইয়া গেল। পত্নীর অহেতুক দীর্ঘ নীরবতার সমাধান করিতে সমস্ত বুদ্ধিব্যয়ে অপারগ হইয়া, এ অভিশপ্ত বয়সে মানুষ যেরূপ করে, সৃষ্টি তাহার উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি লইয়াও সেইরূপই করিয়া বসিল। অর্থাৎ, পত্নীর ঐকান্তিক ভালবাসায় সে সন্দিহান হইয়া পড়িল, যদিও এরূপ সন্দেহ করিতেও তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ হইতে চাহিল।······

প্রাণে যখন এমনি অসহ ব্যথা তখন কিরণ আসিয়া একদিন তাহাকে এই মেসের কোণার ঘরখানিতে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল তাহার কবিতার খাতা সমেত। খাতাটি গোপনীয়, কিন্তু কিরণের সহিত যুঝিবার ক্ষমতাও তখন সৃষ্টির ছিল না। কিরণ দু একটি পাতায় চোখ বুলাইয়া লাফাইয়া উঠিল, এমনি প্রাণস্পর্শী কবিতা। কহিল, "পাহাড় জঙ্গলে থেকেও সাধু সন্ন্যাসীরা এ ভাবে আত্ম-

গোপন কর্ত্তে পারে না সৃষ্টি, যে ভাবে তুমি নিজেকে কচ্ছ। কি লেখা তোমার, একেবারে masterpiec !"

সৃষ্টি বিষণ্ণভাবেই বলিল, "দোহাই তোমার ভাই, খাতাখানা দাও। ওতে পৃথিবীর কারো কোন দরকার নেই, এ শুধু আমার সুখদুঃখের কথা।"

কিরণ পাতা উল্টাইয়া বলিল, "সুখদুঃখের কথা না হলে কি ভাই প্রাণে পৌঁছে। ঐ এক যায়গায় ত সমস্ত মানুষের তন্ত্রী। আঃ কি ঘা-ই তুমি দিয়েছ, ইচ্ছা হয় তোমার পায়ের ধূলো নেই। কি সব-যাচ্ছেতাই কবিতা মাসিকে বেরয় শুধু পাতা ভরাবার জন্য, আর এর একটি কবিতা পেলে মাসিকগুলো ধন্য হয়ে যেতে পারে। তারপর ভাই, ও মেস ছাড়্‌লে ঠিকানাটাও দিয়ে আসনি।"

সৃষ্টি বিরসভাবে বলিল, "তোমাকে চিঠি লিখ্‌ব লিখ্‌ব ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু ঠিকানা ভুলে গেছি। আর—"

"কেন পিসেমশায়ের বাসা থেকে ঠিকানা পেতে। ভাল কথা. "আর্য্যনারী"'ত একটাও প্রবন্ধ ট্রবন্ধ পাঠাও নি, আচ্ছা লোক যা হোক্। আজও স্মৃতি সে কথা বল্‌ছিল। তুমি লিখ্‌বে বলে তারা বিজ্ঞাপনও প্রচার করেছে। প্রথম মাসের কাগজ বেরিয়েছে,—তোমার আর্টিকেল না পাওয়ায় স্মৃতি ভারি দুঃখিত। বেশ কাগজটি হয়েছে।"

সৃষ্টি অন্যমনস্কভাবেই কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল। রঙ্গিন মলাট, তাহাতে একটি উৎকৃষ্ট ব্লক, নীচে লেখা 'আর্য্যনারী', লেখক লেখিকার বিজ্ঞাপনীতে প্রথমেই তাহার নাম।

কিরণ বলিল, "মলাট আগেই ছাপান হয়েছিল। আর্য্যনারী ডিজাইন আমি আর অরুণিমা দু'জনে করেছি। ভারতীয় নারীদের আর্য্য-নারীর গুণে মণ্ডিত করা এই কাগজের একটি লক্ষ্য তাই, আর আর যা উদ্দেশ্য সেদিন স্মৃতির কাছেই সব শুনেছ।" তারপর কাগজখানি সৃষ্টির হাত হইতে লইয়া প্রথম পাতাটি খুলিয়া কিরণ সৃষ্টিকে বলিল, "এই কবিতাটি পড়।" কবিতাটি কাগজের আগমনী স্বরূপ। সৃষ্টি নীরবে পড়িলে কিরণ উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসিল, "কেমন লাগ্‌লো ?"

সৃষ্টি সংক্ষেপে উত্তর করিল, "বেশ।"

কিরণ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "ও মন রাখা কথা। অন্তর্দৃষ্টি আছে তোমার, সমালোচনা কর।"

সৃষ্টি আবার চোখ বুলাইয়া বলিল, "সত্যি বেশ সুন্দর।"

কিরণ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "চমৎকার, আমি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি, মেয়েদের হাত দিয়ে এমন কবিতা বেরয় আমার এ ধারণাই ছিল না। অরুণিমাকে congratulate না করে থাকা গেল না। তুমি ত গুণবিচার কর্ত্তে পার,—আমার এ ভাব অন্ধ উপাসনা নয়—না ?"

সৃষ্টি শুধু মাথা নাড়িল। অরুণিমা সম্বন্ধীয় আলোচনা এইরূপ সংক্ষেপে শেষ করায় কিরণ খুসী হইতে পারিল না, বলিল, "তুমি বড্ড গম্ভীর হয়ে গেছ হে। বিরহের সমস্তগুলি চিহ্ন তোমার ফুটে বেরিয়েছে, যদিও তা বুঝ্‌বার মত জ্ঞান আমার যথেষ্ট নেই।

থাক্, আজ আর তোমাকে ঘেঁটে ফল নেই। আজ তাহলে আমি চল্লুম ভাই।”

কিরণ কাগজ ও খাতাখানিসহ রওনা হইবার আয়োজন করিল। সৃষ্টি ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ওকি, আমার খাতাখানি দাও।”

কিরণ তাহা বগলতলায় রাখিয়া বলিল, “কি রকম? পরের সংখ্যা আর্য্যনারীতে বেরুবে যে।”

সৃষ্টি মাথা নাড়িয়া বলিল, “তা হয় না। ও সব আমি কখনো ছাপাতে পার্ব্ব না, আমায় মাপ কর।”

কিরণ ফিরিয়া ধপ্ করিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল, বলিল, “তোমার মত অদ্ভুত মানুষ দু'টি দেখেছি আমার মনে পড়ে না। মানুষ কি লেখে তার লেখাগুলি খাতার পাতার ভিতর পূরে রাখ্বার জন্য?”

সৃষ্টি হাসিল না, গম্ভীরভাবে বলিল, “জানই ত চিরদিন আমি অদ্ভুত। আমার কিছু পৃথিবীকে আমি কখনো জান্তে দিতে চাই নি, কখনো চাই না। এ খাতার বাইরে যাবার জন্য এ সবের জন্ম হয় নি।”

চক্ষু দু'টি বিস্তৃত করিয়া কিরণ বলিল, “তাতে লাভ?”

সৃষ্টি তেমনিভাবে বলিল, “মানুষ কি সব কাজই লাভ লোকসানের ওজনে করে? তা ত করে না। কেন এ সব লিখি, লিখে লাভই বা কি আমি জানি না, জান্তে চাইও না। অবসরে সুখদুঃখ ভুল্বার এই পন্থা, এটুকুই হয়ত আমার লাভ। আমার

গোপন ইতিহাস এ, কাউকে এ সব আমি জান্‌তে দিতে পারি না।"

"কাব্য মাত্রই কবির গোপন কথা, কিন্তু তোমার মত নির্ম্মম কবি দেখি নি। জগৎকে এ হতে বঞ্চিত রাখায় পাপ আছে তা জান ?"

সৃষ্টি নীরস ভাবে বলিল, "পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোনও দেনা-পাওনার সম্পর্ক নেই,—সে আমার কাছে কিছু চায় না, আমিও চাই না। দাও খাতাখানা।"

কিরণ তাহার অন্তস্তলে পৌঁছিতে পারিল না, বলিল, "আচ্ছা দিচ্ছি, কিন্তু একটি কবিতা তোমায় দিতেই হবে। একটি অন্ততঃ ভাই, স্মৃতি ভারি খুসী হবে।"

সৃষ্টি তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, শুধু বলিল, "একটিও না।"

কিরণ রাগ করিয়া খাতাখানা তাহার কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, কিন্তু যাইবার সময় হাসিয়া বলিল, "Taming of the Shrew ভোল নি নিশ্চয়। অবস্থাভেদে ওরূপ ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়।"

(৮)

একটি দিনের পর একটি দিন করিয়া পূরা একটি মাস চলিয়া গেল, কিন্তু সুরুচির চিঠি আসিল না। প্রাণভরা উপহারের অপমানটা ক্রমশঃই সৃষ্টির বুকে শেলের মত বাজিতে লাগিল। প্রবল অভিমানের ভিতরও পত্নীর অহেতুক নীরবতায় তাহার

অসুস্থতার আশঙ্কা করিয়া সৃষ্টি আর একখানি চিঠি সুরুচিকে লিখিয়াছিল, এবং তাহার একটুখানি ক্ষমা প্রার্থনায় ক্ষমা করিবার জন্য বুকখানি যথেষ্ট উদার করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু বজ্র যেমন অগ্নি মুখে করিয়া আসে তেমনি যেদিন সুমতির চিঠি কতকগুলি মিথ্যা সংবাদ বহিয়া আনিল সেদিন সৃষ্টি সে সব কথা অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করিয়া সুরুচি সম্বন্ধীয় সমস্ত রঙ্গিন স্মৃতি আকাশকুসুমের মত মুছিয়া ফেলিল, এটুকু ভাবিবার অবসর পাইল না যে ইহার কতটুকু সম্ভব, কতটুকু অসম্ভব। সুমতি জানাইয়াছিল পিতৃধনগর্ব্বিতা বধূ তাহার সামান্য উপহার ঘৃণাভরে তাহাদের সাম্‌নেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, এবং তাহাতে মায়ের সহিত মুখোমুখি হওয়ায় তেজভরে পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে। সৃষ্টির অভিমানজর্জ্জরিত প্রাণ এমন অবিশ্বাস্য কথাগুলিতেও আস্থা স্থাপন করিল, অতি ভয়ঙ্কর দিব্বি কাটিয়া ও পক্ষের প্রতিবাদের পথঘাট বাঁধিয়া রাখায় ওদিক্‌ হইতে আত্মপক্ষে যখন কোনও জবাবই আসিল না তখন অনেক হাকিমের মত সৃষ্টিও একতরফা ডিক্রী দিয়া ফেলিল।

কিন্তু এ বয়সে প্রাণ স্নেহের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সৃষ্টির বুভুক্ষু প্রাণ স্নেহের জন্য বিশ্বময় ছুটিয়া মরিতে লাগিল। করুণ কাব্য তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়িল, কারণ বিশ্বসংসার ভুলিবার এইমাত্র মহৌষধি।

মাসকাবারে মাহিনার টাকা সৃষ্টি মাকে নিয়মিত পাঠাইত, এবং ও পক্ষও পুত্রটিকে বেশ কাছে ধরিয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট তারিফ করিত,—পুত্র ও বধূর বিচ্ছেদ

ঘটাইতে যাইয়া পুত্রের সহিত নিজেদেরও সাগরপ্রমাণ ব্যবধান আনিয়া দাঁড় করাইতেছে, মাসকাবারে টাকা পাইয়া এ কথা তাহারা ধারণায় আনিতে পারিত না। গ্রীষ্মের ছুটি আসিল, আসিয়া ফুরাইয়া গেল, কিন্তু সৃষ্টির প্রতিনিধি অর্থগুলি পাইয়াই যেন তাহারা সৃষ্টির অভাব পূরণ বোধ করিল।

এমনি দিনে কিরণের সহসা আবির্ভাবে তাহার জীবন ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইল। কিরণ যেমন সহসা আসে সহসা যায় তেমনি সহসা একদিন সৃষ্টির মেসে আসিয়া তাহার পেঁচাপানা স্বভাবের জন্য অভিনন্দন করিয়া দু'সংখ্যা আর্য্যনারী তাহার কোলের উপর ধপ্ করিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "এরই নাম tit for tat."

সৃষ্টি অর্থ না বুঝিয়া কাগজ দু'খানা হাতে করিয়া বলিল, "কোথায় এদ্দিন ছিলে, কোথা থেকেই বা হঠাৎ ধূমকেতুর মত এলে ?"

কিরণ বলিল, "আমি উল্কা,—তেম্নি অবাধ দ্রুতগতি, তুমি বরং ধূমকেতু,—মেস ও কলেজ তোমার আবর্ত্ত। এ ক'মাস কোথায় কোথায় ঘুরেছি জান ? বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোর, বহরমপুর, রাজসাহী, ঢাকা।"

নিঃসঙ্গ নীরব জীবনে শ্রান্ত সৃষ্টি আজ কথা কহিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল, "হঠাৎ প্রত্নতাত্ত্বিক হয়ে পড়লে নাকি ? কোথায় কি সন্ধান পেলে ? বীরভূম যাও নি।"

কিরণ ঝাঁকিয়া বসিয়া বলিল, "ও বালাই আমার নেই। গিয়েছিলাম এই আর্য্যনারীর জন্য এ শর্ম্মা যাতে হাত দেয় তা অসম্পূর্ণ রেখে আসে না, প্রায় তিন হাজার গ্রাহক যোগাড় করে এসেচি। কল্‌কাতা ও আশপাশে হয়েচে শ'চারেক। প্রথম বচ্ছর কম নয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা বেরিয়ে গেছে, খোঁজও রাখ না। অন্য পত্রিকায় সমালোচনা অবধি বেরিয়ে গেছে। দেখ হে সমালোচনার শক্তি আমার অসীম কি না। তোমার কবিতা 'মর্ম্মের কথা'র সমালোচনায় 'জননী' সম্পাদক দীনেশবাবু বলেছেন এমন কবিতা কোনও নূতন কবির হাত দিয়ে বেরুতে পারে না। নিশ্চয় কোনও শ্রেষ্ঠ কবি ছদ্মনামে লিখেছেন। কত বড় compliment !"

সৃষ্টি অবাক্ হইয়া বলিল, "আমার কবিতা কি রকম ? আমি ত কাউকে কবিতা দেই নাই।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "কবিদের মনের ভাষা সময় সময় মুখে reveal (প্রকাশ) হয়ে পড়ে, হয় ত বা কোনও আর্ট ষ্টুডিওর নেগেটিভে তা পড়ে গিয়েছিল এবং একদা কোনও মাসিকপত্রের সম্পাদক সেই পথে যেতে যেতে—"

সৃষ্টি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "তোমার ও সব হেঁয়ালি রাখ। বড্ড বাজে বক তুমি।"

কিরণ নিমেষের ভিতর দু'খানি কাগজের পাতা উল্টাইয়া দু'খানিই সৃষ্টির চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল, একটি আর্য্য নারীর কবিতা 'মর্ম্মের কথা', আর একটি 'জননীর' সমালোচনা।

সৃষ্টি নিজের কবিতাটি তাহার নাম সহ আর্য্য নারীতে প্রকাশিত দেখিয়া প্রথমটা বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু 'জননী'তে তাহার স্তুতিবাদ দেখিয়া এমন একটু তৃপ্তিও বোধ করিল যাহা সম্পূর্ণ অভিনব। আপনার মনে, আপনার তৃপ্তিতে সঙ্গীতরত পাখী যদি জানিতে পারে আত্মহারা হইয়া সমস্ত জগৎ তাহার কলকণ্ঠ শুনিতেছে, তাহা হইলে তাহার যেমন অনুভূতি হয় ইহাও তেমনি। এতদিন সৃষ্টি শুধু নিজের তৃপ্তির জন্য লিখিয়াছে,—এ সবের যে মূল্য আছে, আরো দশ জনকে তৃপ্ত করিতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিয়া তাহার বুকে তৃপ্তির এক নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিল। সন্তানের গুণমুগ্ধা জননী যখন বুঝিতে পারেন আরো দশজনে তাঁহাব সন্তানটির গুণে মুগ্ধ, ইহা তাহার অন্ধ সন্তান-বাৎসল্যই নহে, তখন তাঁহার প্রাণে তৃপ্তির যেমন নূতন মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে এও তেম্নি।

"আচ্ছা লোক ত তুমি, খাতাখানা ত আমার কাছে ছিল, কি করে পেলে?" সৃষ্টি এমন স্বরে কহিল যাহাতে বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না। কিরণ বুঝিল, হাসিয়া বলিল, "দাদা থার্ড ক্লাসই না হয় পাস করেছি, তাই বলে স্মরণশক্তি তোমার চেয়ে থোড়া নয়। সেদিন তোমার খাতা থেকে এই কবিতাটি মুখস্থ করে গিয়েছিলাম। জানি তোমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, দেবে তো নাই। কেমন গুণ বিবেচনার শক্তি আমার কি কম,—তখনি ত বলেছিলাম।"

সৃষ্টি বলিল, "তবু অন্যায় করেছ। আত্মপ্রকাশ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

"তাই কবির ও কথাটাও কাঁটায় কাঁটায় সত্য হয়—

'Full many a flower is born to blush unseen'.—

কিন্তু আমার এ এক ধাত, নজরে কোনও ফুল পড়লে তাকে নীরবে ঝর্‌তে দিই না। দু'টি ফুল সম্প্রতি আমার নজরে পড়েছে—তুমি আর অরুণিমা, দু'টিকেই আমি জগতের সাম্‌নে দাঁড় করাব, তবে ছাড়ব। অরুণিমার কবিতাটি পড় একবার 'নিদাঘ সন্ধ্যায়'। ভাবের মুন্সীয়ানা আছে। এরও ভাল সমালোচনা হয়েচে।"

সৃষ্টি পড়িল, বলিল, "আশ্চর্য্য একজন আর একজনের কথাগুলি এমন হুবহু বলে যায় যেন মনের সবগুলো কথা চুরি করে নিয়েছে।"

কিরণ বিজ্ঞের মত বলিল, "নিখিলের বুকে একটি অনাহত সুরই বেজে যায়,—তোমারও, আমারও, তারও। খালি ফুটিয়ে তুল্‌বার ক্ষমতার অভাবে সুর মর্ম্মের মাঝেই গোপন থেকে যায়।"

সৃষ্টি নীরবে কবিতাটি আবার পড়িল, কবিতাটি তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। বলিল, "এটিতে সুর দিলে বোধ হয় বে-মানান হয় না।"

কিরণ উৎসাহিত হইয়া বলিল, "ঠিক বলেছ। এ খেয়াল আমার মাথায় আসেনি। কবি তুমি, তোমার ideaও কবিত্ব-ভরা। বেশ ত, আজই সন্ধ্যায় চল পিসেমশায়ের বাড়ী। অরুণিমাও আস্‌বে। কবিতা ও সুর বিভিন্নরূপে এবং মিলিত হয়ে

কেমন মূর্ত্তি ধরে অনুভব করে লিখ্‌বার মত তুমি প্লট পাবে নূতন। তুমি গেলে ওরা সবাই সুখী হবে, দেখেচ ত কি social এরা। সাহিত্যিকদের একটা সমাজ না হলে তাদেরও কাব্য স্ফূর্ত্তি হয় না।”

প্রথমে সৃষ্টি নানা অজুহাতে এড়াইতে চাহিল, অবশেষে সাহিত্যালোচনায় নিঃসঙ্গ ভারক্লিষ্ট মনটা একটু তাজা হইবে ভাবিয়া কিরণের অনুরোধে স্বীকৃত হইল।

আজিও অরুণিমা, মঞ্জুষা প্রভৃতি স্মৃতিদের বাড়ী আসিয়াছিল। কৃপাময়বাবু সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সাহিত্যের মধুময় আলোচনায় সঙ্কোচ ভাবটা দূর হইলে সৃষ্টির ভারাক্রান্ত মনটা বেশ হাল্কা হইয়া উঠিল, এবং কিরণ মাঝে মাঝে তাহার স্বভাব-সুলভ সরল কথায় সকলের ভিতর একটি নির্ম্মল আনন্দের ফল্গু বহাইতেছিল। সৃষ্টির লাজনম্র শিষ্ট ব্যবহারে তরুণীগণ তাহাকে তাহাদের একটি বিশিষ্ট বন্ধুরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সৃষ্টির সঙ্কোচ দূর হইয়া ক্রমে তাহার সরল স্বাভাবিক মূর্ত্তি বাহিরে প্রকাশ হইতে লাগিল।

অরুণিমার কবিতাখানি সকলকেই স্পর্শ করিয়াছিল। স্বাভাবিক সারল্যে সৃষ্টিনাথ কবিতাটিব এ ভাবে প্রশংসা করিল যে তাহা স্তুতিবাক্যের রূপান্তরে দাঁড়াইল, এবং দুষ্টু কিরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সমালোচক এবং লেখিকা দুইজনই এক সঙ্গে আরক্তিম হইয়া উঠিল। কখন যে কিরণ কবিতার খাতাখানি বগলচাপা করিয়া আনিয়াছে, সৃষ্টি তাহা টেরই পায় নাই, কিন্তু এই সব

সাহিত্যিক বন্ধুদের সাম্‌নে সহসা ঐ গোপন খাতাটি প্রকাশ হইতে দেখিয়া সৃষ্টি স্থানকাল ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অন্যায়, এ অন্যায় কিরণ, এ ভাবে একজনের গোপন কিছু তার অসম্মতিতে নিয়ে আসা।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "দণ্ডবিধির মতে যদিও এ ধারার কার্য্য চৌর্য্যরূপেই উক্ত, কিন্তু তার রেহাইও আছে সাধারণ ব্যতিক্রমের পরিচ্ছেদে। আর আকাশ বাতাস এ সব থেকে লোককে বঞ্চিত রাখ্‌লে যেমন তার দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, সুধীসমাজে তোমার ও ধারায় দণ্ডবিধিও আছে বিশেষ রকম, তা বোধ হয় এ সম্মিলনীতে কেউ অস্বীকার কর্ব্বে না।"

কিরণের কথার ভঙ্গীতে তরুণীরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্মৃতি বলিল, "তুমি কথাগুলো বড্ড mystic করে ফেল কিরণদা, আমাদের বোঝাই দায়।"

কিরণ বলিল, "এটি হচ্ছে সৃষ্টিবাবুর কাব্য অথবা সৃষ্টিবাবু personified, অর্থাৎ এখানেই ওর যথার্থ বিকাশ, কারণ কবির যথার্থ বিকাশ তার কাব্যের ভেতর দিয়ে তোমরা বলে থাক। আর ঐ যে কাপড় চোপড়পরা লোকটি দেখ্‌চ, উনি হচ্ছেন নকল সৃষ্টিবাবু, ওখানে ওর যথার্থ পরিচয় নেই। বন্ধুটির যথার্থরূপের সাথে তোমাদের পরিচিত কর্ব্বার এ ব্যবস্থা করেছি বলে উনি যে সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আমার তুলনা কল্লেন, তাদের নাম পুলিশের রেজেষ্ট্রী ছাড়া আর কোনও সমাজে পাবে না।"

তরুণীরা আগ্রহ সহকারে কিরণের দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, "সৃষ্টি-

বাবুর কবিতা—দেখি দেখি। নিয়ে এসেছেন বুঝি ওঁর বাড়ী থেকে, বেশ করেছেন। যে লাজুক উনি।”

সৃষ্টির সুগৌর মুখখানি টক্‌টকে হইয়া উঠিল, সে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, “কিরণ বড্ড ছেলেমানুষ। ও কি লেখা, না কাউকে দেখাবার মত। অবসর সময় যখন খারাপ লাগে তখন সময় কাটাবার জন্য যা মনে আসে লিখি, কোন কাজের নয়, ছাই। ও সব আপনাদের দেখবার যোগ্যই নয়।”

ততক্ষণ কক্ষটি প্রশংসা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তরুণীরা প্রশংসমান নেত্রে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিল। সব চেয়ে বিস্মিত হইয়াছিল অরুণিমা, কবিতাগুলি তাহার এত পরিচিত মনে হইল। বলিল, “আশ্চর্য্য শক্তি আপনার সৃষ্টিবাবু, মনে হয় যে সব চিরপরিচিত ভাবের সহিত আমরা অপরিচিত থেকে যাচ্ছিলেম সে সবের সঙ্গে আপনি নূতন করে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন,—যেন হারানো বন্ধুর খোঁজ দিচ্ছেন।”

স্মৃতি বলিল, “ঐখানেই ত কবির কৃতিত্ব। যে সব সুর অনুক্ষণ আমাদের আশেপাশে ভেসে বেড়ায়, অথচ আমরা ধর্ত্তে পারি না, কবিরা সে সব আমাদের ধরে দেয়, তাই মনে হয় তারা হারানোকে ফিরিয়ে আনে, নির্জ্জীবকে সজীব করে দেয়।”

সৃষ্টি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, “বড্ড high compliment হচ্ছে। কিন্তু ‘নিদাঘ সন্ধ্যায়’ কবিতাটি পড়ে আমারও ঠিক এম্নি কথা মনে এসেছিল। যেন কথাগুলো বড় আপন।”

কিরণ দুষ্টামী করিয়া কহিল, “তাই নাকি? তোমার হয়ে

সেই অনুরোধটা এক্ষেত্রে করা যাক্। সৃষ্টিবাবুর ইচ্ছা সেই কবিতাটী একবার সুরলয়সংযোগে মূর্ত্তি গ্রহণ করুক্। কবির এ আর্জ্জি কবির দপ্তরে কখনো না-মঞ্জুর হবে না।”

অরুণিমা রঞ্জিত হইয়া অসম্মতি জানাইল, কিন্তু অন্যান্য তরুণীরা তখন নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়াছিল, কাজেই তখুনই একটি সুর দিয়া অরুণিমাকে কবিতাটি গাহিতে হইল। সেই প্রাণস্পর্শী কবিতা আর সেই সুমধুর কণ্ঠের সম্মিলিত মাধুর্য্যে সৃষ্টির প্রাণের সমস্তগুলি তার আবার ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।...

স্মৃতির ঐকান্তিক অনুরোধে সৃষ্টিকে তাহার খাতাখানি ‘আর্য্যনারীর’ জন্য রাখিয়া আসিতে হইল। কিন্তু সেদিন রাত্রিতে মেসে একা শয্যায় পড়িয়া আত্মদৃষ্টিরত সৃষ্টি দেখিতে পাইল খাতাটির সহিত আরও কিছু যেন সে ঐ সম্মিলনীতে ফেলিয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে তাহার শূন্য নীরস হৃদয়টি একটা অজানা শিহরণে ভরাট হইয়া আসিতেছে। সঙ্গীতকারিণী সায়রেনদের কথা চকিতে মনে পড়ায় যদিও সে নিজেকে কঠিন গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিল, তথাপি কিরণের দৌরাত্ম্যে তাহাকে এই সব তরুণীর সংসর্গ হইতে দূরে রাখিবার যো রহিল না, এমনি অখণ্ডনীয় যুক্তি আনিয়া সে দাঁড় করাইত।

কিরণের মধ্যস্থতায় ক্রমে অরুণিমার সহিত সৃষ্টির পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল। এই গুণবতী বিদুষী তরুণীটির এমনি আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার ফলে একটু একটু করিয়া সৃষ্টি তাহার গুণমুগ্ধ উপাসক হইয়া পড়িল। সঙ্গীত ও কাব্যচর্চ্চার ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে

সৃষ্টি তাহার ইচ্ছাকৃত দূরত্বের ব্যবধান সরাইয়া অরুণিমার দিকে মুগ্ধ উপাসকের মত আসিতে লাগিল, দু'জনের একজনও তাহা বুঝিতে পারিল না, এমন কি কিরণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এখানে পরাজিত হইল।...পরে এমন হইল যে পত্নীর মর্ম্মান্তিক ব্যবহারটাও সৃষ্টি একটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া যাইয়া জীবনটাকে নূতন ভাবে ভরাট করিয়া আনিল।

৯

সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটা ঘা লাগিল সেদিন, যেদিন কিরণ সৃষ্টিকে তাহার বিলাত-যাত্রার কথা জনাইয়া অরুণিমার প্রতি গভীর প্রেমের ইতিহাসটুকু জ্ঞাপন করিল। এ কথাটি এতদিন সে উহ্য রাখিয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ স্ববশে থাকিলে এতদিন ব্যাপারটা সৃষ্টির নজর এড়াইত না। নামজাদা ব্যারিষ্টার ত্রিগুণাতীত রায়ের এই বিদুষী কন্যাটিকে প্রথম দর্শন হইতেই কিরণ কি প্রীতির চোখে দেখিয়াছিল এবং ধীরে ধীরে তাহার প্রেমতরুটি কেমন পত্রে পুষ্পে মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে কহিয়া কিরণ অবশেষে জানাইল যে, তাহার বিলাত-যাত্রার কারণ শুধু এই গুণবতী রমণীরত্ন লাভ,—কারণ ব্যারিষ্টার বা অমনি কিছু হোম্‌রা চোম্‌রা না হইলে তাহার সে আশা দুরাশা মাত্র। বন্ধুর এই প্রেমের ইতিহাসে উৎফুল্ল না হইয়া বিরস হইবার কারণটা যে কি এবং কেন, সৃষ্টি তাহা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াও পাইল না। সাহিত্য-বন্ধু ছাড়া আর কোন দাবীই ত অরুণিমার উপর তাহার থাকিতে পারে না, এবং

উদারমতি কিরণের সহিত পরিণীতা হইয়াও সে সেই মধুর সম্বন্ধ অটুট রাখিবে এ ধারণাও ভিত্তিহীন নয়, তবু অমন বিষণ্ণ হইবার হেতু ভাবিয়া স্মৃষ্টি আকুল হইল। কিরণ চলিয়া গেলে নির্জ্জনে আত্মদর্শন করিয়া স্মৃষ্টি বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিল, কারণ অজ্ঞাতসারে সে এমনি পথেই অগ্রসর হইয়াছে যে পথ তাহার ও অরুণিমার দু'জনের পক্ষেই অকল্যাণকর। অসীম মানসিক বলে স্মৃষ্টি তখনি ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং গভীর ভাবে আপনার নিত্যকর্ম্ম ও নির্জ্জন সাহিত্যসেবায় নিজকে ডুবাইয়া দিল। ও সমাজে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবার কেহ ছিল না,—স্মৃষ্টি যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। 'আর্য্যনারী' প্রতিমাসেই তাহার একটি কবিতা বুকে করিয়া বাহির হইত, অন্যান্য কাগজে তাহার উচ্চ সমালোচনা হইত,—স্মৃষ্টি নীরবেই তৃপ্ত হইত। কিন্তু অরুণিমার কবিতাগুলি তাহার মুখস্থ হইয়া গেল,—সমস্তগুলি কবিতার পেছনে একটি সুরের হাওয়া ঘুরিয়া ফিবিয়া এক অভিনব উন্মাদনার স্মৃষ্টি করিয়া দিল! কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্মৃষ্টি অরুণিমার সমস্ত পরিচয় অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিল, যেন ইহাকে সে দেখে নাই, শোনে নাই, ইহার ছায়াও মাড়ায় নাই। মাঝে মাঝে এরূপও বিরল হইত না ইডেন উদ্যান বা গড়ের মাঠের কাছাকাছি খোলা মোটর হইতে স্মৃষ্টির উদ্দেশ্যে দু'টি শুভ্র হস্ত নীরব অভিবাদন জানাইয়া গিয়াছে, পলায়নরত স্মৃষ্টি প্রত্যাভিবাদনের সময়টুকু করিয়া উঠিতে পারে নাই, অথবা এমন ভাবে চোখ ফিরাইয়া রহিয়াছে যেন সে তাহার চোখেই পড়ে নাই। স্মৃষ্টির কার্য্যকলাপ অরুণিমার দৃষ্টি এড়াইত

না, স্মৃতির সহিত দেখা হইলে বলিত "সৃষ্টিবাবু নিজের কবিতার চেয়েও বেশী mystic. তাঁকে বুঝে ওঠা গেল না। ক'দিন আমাদের সঙ্গে দিব্বি মিশলেন, সাহিত্যালোচনা কর্লেন, আবার দু'দিনেই দুর্ব্বোধ হয়ে গেলেন। রাস্তায় দেখা হলে এমন ভাবে পাশ কাটান যেন কোন কালে চেনা নেই। কিন্তু ওজন্যেই লোকটাকে লাগে ভাল, তাঁকে বুঝে ওঠা যায় না।"...

ইতিমধ্যে কন্যার তাড়নায় সৃষ্টির-মা একটি মনোমত পাত্রীর সন্ধান করিয়া পুনর্ব্বিবাহের জন্য সৃষ্টিকে তাগিদের পর তাগিদ দিতে সুরু করিলেন। শাশুড়ী ননদের অপমান, লাঞ্ছনা, দুর্ব্যবহার সুরুচি যেরূপ নীরবে সহিতেছিল তাহার পিতা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী উমাশঙ্কর রায়ও ঠিক তেমনি নীরবে সহিবেন জমীদারের কুষ্ঠিপত্রে এমন কথা লিখে নাই। শুধু জামাতার দিকে চাহিয়াই তিনি এ দরিদ্র-গৃহে মেয়ে দিয়াছিলেন, এবং আশা করেছিলেন জামাতাটি উপযুক্ত হইয়াই সুরুচিকে কর্ম্মস্থলে লইয়া যাইবেন। অবশ্য শাশুড়ীর হস্তে কন্যাটির নির্য্যাতনের প্রথম হেতুই তিনি, কারণ দারুণ কার্পণ্যহেতু বৈবাহিকাটিকে তিনি আদৌ সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, এবং সেই অসন্তুষ্টির সমস্ত ঝাল আসিয়া পৌঁছিত অবশেষে ঐ নির্ব্বাক্ বধূটিকে। অধিকন্তু কন্যাকে বিষয়ের যৎসামান্য অংশ দিয়া জামাতাকে স্বগৃহেই প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা একদা প্রকাশ করিয়া বৈবাহিকার মনে তিনি একটি ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই ভাবে তাহার একটি মাত্র পুত্রটিকে তিনি পর করিয়া দিবার চেষ্টায় আছেন, এবং ইহার মূলে

ঐ মিট্‌মিটে ডান বধূ। তারপর অশিক্ষিতা পল্লীরমণীদের অলস মধ্যাহ্নের মজলিসে উর্ব্বর কল্পনা-প্রসূ মস্তকউদ্ভূত গবেষণার ফলে ব্যাপার ক্রমে কেমন ভয়াবহ দাঁড়াইয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ না দেওয়াই ভাল, কারণ তাহা পল্লীপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রীতিপ্রদও হইবে না।

সুরুচি সেদিনকার কথা পিতাকে না জানাইলেও সে কথা বহিয়া নিবার লোকের অভাব গ্রামে ছিল না। উমাশঙ্করবাবু লোক পাঠাইয়া এক প্রকার জোর করিয়াই কন্যাকে যখন গৃহে লইয়া গেলেন তখন অভিধানবহির্ভূত বিবিধ কটুকাটব্য করিয়া অবশেষে সৃষ্টির-মাতা ও ভগ্নী দু'জনেই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, মাস না ঘুরিতেই সোণার চাঁদ ছেলে সৃষ্টির জন্য পরী-বৌ খুঁজিয়া আনিবেন। সেই মর্ম্মে সৃষ্টিকে চিঠি লিখিয়া কোনও সাড়া না পাইয়া মাতা-পুত্রী বিষণ্ণ-নেত্রে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া এই একই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, বৌটার পটলচেরা চোখের নজরে হতভাগাটা একেবারেই গোল্লায় গিয়াছে। কিন্তু গোল্লায় যাওয়ার বিপক্ষে জাজ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ মাসকাবারে খোরাকী বাদে সৃষ্টির পুরা মাহিনা আসাতে তাহারা ভরাপেট খাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পাত্রী অনুসন্ধানে লাগিয়াছিলেন। ধনীর চেয়ে মাঝারি গৃহস্থ এবার বেশী পছন্দ-সই হইল, কারণ ঘর জামাই করিবার দুঃসাহস তাদের নাই, এবং টানা হেঁচড়া করিয়া যথেচ্ছভাবে বৌ লইয়া যাইবার ক্ষমতাও থাকে না। মনোমত পাত্রীটি কামাখ্যাসুন্দরীর ভাইঝির ভাসুরের কন্যা, রূপে গুণে এক 'লঙ্কাকাণ্ড',—অর্থাৎ

কালো আঁটসাট কোমরে কাপড় জড়াইয়া একশ লোকের নিমন্ত্রণ একেলা রাঁধিতে, দু'দশ মণ ধান ভানিয়া মুড়ি ভাজিতে, নিমেষের ভিতর একমাথা উকুন সমূলে বিনাশ করিতে, এবং কলহের গন্ধ পাইলে সমস্ত পাড়াটা নাচিয়া আসিতে তাহার মত দক্ষ নাকি সে তল্লাটে কেহ ছিল না। গুণগুলি কাট ছাঁট করিয়া কামাখ্যা-সুন্দরী এমন বিনাইয়া কহিলেন যে, শুধু বাঁশী শুনিয়াই সৃষ্টির মা ও ভগ্নী মুগ্ধ হইয়া গেলেন। দরদস্তুর করিয়া পণ ঠিক হইল দেড় হাজার, গহনা বাবদ এক হাজার। অমনি মা বোন্ তাগিদের পর তাগিদে সৃষ্টিনাথকে উদ্‌বাস্ত করিয়া তুলিলেন।

সঙ্কীর্ণতা ও নীচাশয়তা সৃষ্টির ছিল না। মাতৃভক্তি তাহার ছিল যথেষ্ট এবং পত্নীর অহেতুক অপমানের ঝাঁঝটাও লাগিয়াছিল প্রচণ্ড,—তবু সে বিপক্ষকে অপমান করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার পক্ষে ছিল না। অধিকন্তু যাহাকে জীবনে মরণে সঙ্গিনীরূপে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার সহিত প্রকৃত মিলনের পক্ষে অন্তরায় কোন্‌খানটায় সৃষ্টি এবার কষিয়া লইতে শিখিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মগুলি নীরবে করিয়া যাইতে পারিলেই স্ত্রী স্বামীর বুকে চিরস্থায়ী স্থান করিতে পারে না, তাহার আরও উচ্চতর ও মধুরতর গুণমণ্ডিত হওয়া দরকার, যাহার গুণে পতিপত্নীর হৃদয়ের তার দু'টি একই সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই তুলনায় সাধারণ পাড়াগেঁয়ে মেয়ের চেয়ে অরুণিমা শ্রেণীর বিদুষীর স্থান কত উচ্চে একথাটাও চকিতে মনে জাগিয়া তাহাকে একটু শিহরণ দিয়া গেল।

সে মাকে পরিষ্কাররূপে জানাইয়া দিল যে, বিবাহের সখ তাহার নাই, যে ভুল একবার করিয়াছে পুনর্ব্বার সেই ভুল করিয়া ভুল সংশোধনের বাতুলতা সে বরণ করিয়া লইতে রাজি নয়, কিছুতেই না, এবং এজন্য সে ক্ষমা ভিক্ষা করে। মা ও ভগ্নী তাহাদের স্বভাবানুযায়ী কটুকাটব্য করিয়া গেলেন, কিন্তু হটিলেন না।...

করুণ ও বিরহের কবিতা লিখায় সৃষ্টি ইতিমধ্যে সিদ্ধহস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ তাহার গৃহে ভিড় লাগাইয়া দিয়াছিলেন। কবি বলিয়া সৃষ্টির যশ শারদ-জ্যোৎস্নার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্মিলনী ও এম্নি আরও সভায় মিশিয়া সৃষ্টি স্বনামধন্য হইয়া পড়িয়াছিল, জীবনটিও তার সাহিত্যের স্রোতে তর তর্ করিয়া কাটিতেছিল। অধ্যাপক হিসাবেও হাঁকডাক হইয়াছিল বেশ, এবং বর্দ্ধিত বেতনে দু'একটি কলেজ বদ্লাইয়া স্কটিশচার্চ কলেজে মোটা বেতনে সৃষ্টি স্থায়ী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইল।

ইতিমধ্যে একটি অভাবনীয় ঘটনা সৃষ্টিকে তাহার পরিত্যক্ত পথটিকে নূতন করিয়া টানিয়া আনিল। সেদিন কলেজের পর বৈকালে সৃষ্টিনাথ গড়ের মাঠের দিকে যাইবার জন্য হেদুয়ার মোড়ে দাঁড়াইয়া এস্প্লানেডের ট্রামের অপেক্ষা করিতেছিল। শ্যামবাজার ডিপোর কাছাকাছি লাইনের উপর একটা মালবোঝাই গরুর গাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ায় ট্রামের জন্য প্রায় কুড়ি মিনিট সৃষ্টিকে অপেক্ষা করিতে হইল। সৃষ্টি আন্‌মনে ফুটপাথে পায়চারি করিতে করিতে জনস্রোত ও গাড়ী মোটরের দ্রুত চলাচল দেখিতেছিল। সহসা

একটি মোটর হইতে দু'টি শুভ্রহাত তাহাকে অভিবাদন জানাইতে সৃষ্টির দৃষ্টি মোটরের দিকে আকৃষ্ট হইল। মোটর তাহাকে ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু অরুণিমার সহাস্য মুখখানি তখনো তাহার দিকে ফিরিয়াছিল। বুঝিবা সৃষ্টি তখন কিছু ভাবিতে সুরু করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অদূরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ এবং লোকজনের হুড়াহুড়ি দেখিয়া সৃষ্টি চমকিয়া সেই দিকে ছুটিয়া চলিল। কাছে যাইয়া তাহার শরীরের রক্ত একেবারে হিম হইয়া গেল। প্রকাণ্ড একটা মোটর লরীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া অরুণিমার মোটরখানি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়াছে, সোফার ছিট্‌কাইয়া ফুটপাথের কিনারে আসিয়া পড়িয়াছে এবং অরুণিমা মোটরের সাম্‌নে কুণ্ডলী আকারে অজ্ঞান হইয়া আছে, রক্তে কাপড়ের দু'এক জায়গা ভিজিয়া গিয়াছে। সৃষ্টি ছুটিয়া যাইয়া লোকজনের সাহায্যে অরুণিমাকে পথিপার্শ্বস্থ ডাক্তার-গৃহে লইয়া আসিল, এবং নিজের পরণের কাপড়ের কোঁচা ছিঁড়িয়া ডাক্তারকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে সাহায্য করিতে লাগিল। তাহার শঙ্কাকুল ভাব দেখিয়া ডাক্তার বুঝিলেন ইনি আহতের আত্মীয় এবং আহত স্থান পরীক্ষা করিয়া তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, মাথায় খুলি বা অন্য হাড়ে আঘাত লাগে নাই, ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। সৃষ্টি তখন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে অরুণিমার মূর্চ্ছা দূর হইল, পাঞ্জাবী সোফারটাও ততক্ষণ খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ডাক্তারখানায় আসিয়া আহত স্থানে ঔষধ দিয়া প্রায় চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তারের দর্শনী নিজের পকেট হইতে দিয়া, সোফারকে মোটরের হেফাজতে

রাখিয়া সৃষ্টি যখন অরুণিমাকে একটা ভাড়াটিয়া টেক্সিতে আনিয়া বসাইল অরুণিমা তখন একটু সুস্থ হইয়াছে। সৃষ্টি তাহাকে ধরিয়া পাশেই বসিল। গভীর কৃতজ্ঞতাভরে একবার সৃষ্টির পানে তাকাইয়া অরুণিমা ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদিয়া মাথাটি সৃষ্টির বুকে এলাইয়া দিল। সৃষ্টির তখন সঙ্কোচ বা লজ্জা প্রকাশের সময় ছিল না, এক হাতে তাহার পতনশীল দেহলতা ধরিয়া রাখিয়া কোমলস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেমন বোধ কচ্ছেন এখন?"

ক্ষীণস্বরে উত্তর আসিল, "বড্ড দুর্ব্বল।"

মোটর ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

(১০)

এই সূত্রে মিষ্টার ত্রিগুণাতীত রায়ের পরিবারের সহিত সৃষ্টির পরিচয় নিবিড়তর হইয়া উঠিল। অরুণিমার পরিচিত বন্ধু হিসাবে এই গৃহে সৃষ্টি পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়াছে, কিন্তু এই ঘটনায় মিঃ রায় ও রায়পত্নী সৃষ্টির প্রতি এমন কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িলেন যে কোনও পক্ষে দূরত্বের ব্যবধান এতটুকু রহিল না। তাঁহারা সৃষ্টিকে পুত্রস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ফলে এই গৃহে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সৃষ্টির এক নিত্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, এই বিশিষ্ট পরিবারের শিষ্ট অনুরোধ এড়াইবার পথ সৃষ্টি খুঁজিয়া পাইল না।

অরুণিমাকে ক'দিন শয্যাগত থাকিতে হইল এবং সৃষ্টির সহিত সাহিত্যালোচনা তাহার আঘাত যাতনা ভুলিবার এক মহৌষধরূপে পরিণত হওয়ায় সৃষ্টিকেও বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাটা তাহার শয্যাপার্শ্বেই

কাটাইয়া যাইতে হইত। দু'একদিন না আসিলে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার যাতনা বোধের কথা অরুণিমা এমন ভাবে কহিত যে নিজের ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সৃষ্টি অনুতপ্ত হইয়া উঠিত। ক্রমে ইহাদের অসঙ্কোচপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার সৃষ্টির এক লোভনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। ফলে অরুণিমার আরোগ্য লাভের পরও সৃষ্টির এ সংসর্গ ত্যাগ দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইল, এই মার্জ্জিত পরিবারের সহিত সরলভাবে মিশিবার দোষটা কোঁথায় সৃষ্টি তাহা খুঁজিয়া পাইল না।···

রোগশয্যায় পড়িয়া অরুণিমা যে সব কবিতা লিখিত, সৃষ্টিকে তাহা পড়িয়া শুনাইত, সৃষ্টির কঠিন সমালোচনায় টিকিলে তবে তাহা মাসিক পত্রের সম্পাদকের দপ্তরে যাইত। আবার সৃষ্টি যাহা লিখিত, অরুণিমা অনুমোদন করিলে তবে তাহা ছাপা হইত। দু'জনার চিন্তা ও ভাব এমনভাবে মিলিত যে কাটা ছাঁটা প্রায় কোনও পক্ষেরই প্রয়োজন হইত না।

ইতিমধ্যে সৃষ্টির কয়েকটি কবিতায় অরুণিমা তানলয়সংযোগ করিয়া তাহার স্বরলিপি আর্য্যনারীতে ছাপিয়া ফেলিল। সৃষ্টির মনে হইল তাহার তৈয়েরী নির্জ্জীব মূর্ত্তিগুলিতে অরুণিমা প্রাণসঞ্চার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রাণসঞ্চার করিতেছে কোথায় তাহা কিছুদিন তাহার কাছেও গোপন রহিয়া গেল।

আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা বহুমুখী হইয়া পড়িল। কবির কথা, কাব্যের কথা, দেশের কথা, দশের কথা কহিয়া ধীরে ধীরে তাহারা অজ্ঞাতভাবেই প্রাণের কথা কহিতে

সুরু করিল প্রথম সেদিন, যেদিন অরুণিমা সৃষ্টির কবিতা 'চাওয়া ও পাওয়া'র সমালোচনা করিতেছিল। বুকের অপূর্ণ আশাগুলি সৃষ্টি ভাবের মুখে এই কবিতাতে রঙ্গাইয়া তুলিয়াছিল।

অরুণিমা বলিল, "মানুষের অপূর্ণ স্বপ্নটির ব্যথাভরা রূপ বড় করুণভাবে এ কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে,সৃষ্টিবাবু। সমস্ত পরিপূর্ণতার ভিতরও যে মানুষ নিঃস্ব কাঙ্গাল আপনার হৃদয় যেন হাহাকার করে, সেই কথাই জানাতে চাচ্ছে।"

সৃষ্টি চোখ দু'টি নীচে নামাইল, বুঝিবা অরুণিমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার বুকের গোপন কথাগুলি প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে। সে শুধু বলিত, "একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুক যখন ভরে উঠেছিল তখন এটি লিখেছিলেম, কিন্তু ব্যথাটা যে কি, তা নিজেও জানি না।"

অরুণিমা বলিল, "তাই ত এত প্রাণস্পর্শী। প্রাণের স্বাভাবিক গতি রোধ করে তাতে কৃত্রিমতার আবরণ দেন নাই বলে এত মধুর, এত করুণ। আপনার কবিতাগুলো আমার বড্ড ভালো লাগে সৃষ্টিবাবু, এর ভেতর যেন নিজের প্রকৃত সন্ধান পাই।"

সন্ধ্যার স্নিগ্ধ মাধুরী তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মোটরটা সেদিন মেরামত হইয়া আসাতে অরুণিমা একবার বহুদিন পর মুক্তবায়ু সেবন করিয়া আসিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সোফার আসিয়া মোটর বাহির করিবে কিনা জানিতে চাহিলে অরুণিমা সৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, "সন্ধ্যাটা মুক্তাকাশতলে সাহিত্যচর্চ্চায়

কাটবে ভাল। আপনার বোধ করি তেমন জরুরী কাজ হাতে নেই।”

সৃষ্টি একটু ইতস্ততঃ করিল কিন্তু আপত্তি করিতে পারিল না। একটা শাল গায়ে জড়াইয়া ত্রিগুণাতীতবাবুর বসিবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যখন অরুণিমা সৃষ্টির হস্ত অবলম্বন করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছিল তখন তিনি সৃষ্টিকে ডাকিয়া কহিলেন, “তুমিও সঙ্গে যাচ্ছ সৃষ্টি, বেশ। দুর্ব্বল মানুষ, কেউ সঙ্গে থাকা ভাল।” তার পর সোফারকে ডাকিয়া সাবধান হইয়া মোটর চালাইতে বলিয়া দিলেন।

বাটীর বাহিরে রাস্তায় পড়িয়া সোফার কোন্ দিকে যাইবে জানিতে চাহিলে অরুণিমা সৃষ্টির পানে চাহিয়া সোফারকে যথেচ্ছ চালাইতে বলিল। সোফার আপন বুদ্ধিমত সার্কুলার রোডের দিকে মোটর লইয়া চলিল। সৃষ্টি অরুণিমার পাশেই বসিয়াছিল, দ্রুতগমনশীল মোটর এক-একবার নাচিয়া নাচিয়া ওঠায় অরুণিমার দেহলতা সৃষ্টির বুকের কাছে হেলিয়া পড়িতেছিল, সন্ধ্যার মৃদু-হিল্লোল-তাড়িত কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সৃষ্টির স্কন্ধ, চিবুক স্পর্শ করিতেছিল। দু’পাশের গ্যাস লাইটগুলি তখনো জ্বলিয়া উঠে নাই, সন্ধ্যার ম্লান আভা অরুণিমার গণ্ড স্নিগ্ধমাধুরীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

আলোচনা ক্রমে সাহিত্যের গণ্ডী ছাড়িয়া নিজেদের কেন্দ্রীভূত করিতেছিল। স্বল্পভাষী সৃষ্টি আজ সহসা মুখর হইয়াছিল,—অরুণিমাও কম বকিতেছিল না। সহসা সৃষ্টি বলিয়া ফেলিল,

"সময় যে এত উপভোগ্য জীবনে আজ যেন প্রথম অনুভব কচ্ছি। অবশ্য দু'চারটি নির্দ্দিষ্ট বন্ধু ছাড়া কারু সঙ্গে আমি মিশি নি, আমার জগৎ পুঁথির পাতার ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ মনে হচ্ছে ও ভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ থেকেই বঞ্চিত ছিলেম। Companion (সঙ্গিনী) হিসাবে আপনি অতুলনীয়।"

অরুণিমা ঈষৎ হাসিয়া সহজভাবেই বলিল, "আপনার কাছে এমন Compliment লাভ গৌরবের বিষয়। আপনার ঐ কথাটি আমিও পাল্টে বল্‌তে চাই।"

সৃষ্টি গম্ভীর অথচ করুণ স্বরে বলিল, "মানুষের হৃদয় এক একটি tuning fork দু'টি হৃদয়ের এক সুর না হলে কখনো বাজে না। কিন্তু আমাদের সমাজে নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়েরাও বুকের খোঁজ রাখবার প্রয়োজন বোধ করে না, জীবন তাই শুধু জীবন ধারণই হয়ে পড়ে। অন্ধ বাপ-মায়ের সন্তুষ্টির জন্য একটা যা-তা বিবাহ করে দুর্ব্বহ-জীবন বহন করা আপনার যুক্তিতে কেমন মনে হয়?"

সৃষ্টির করুণ স্বর অরুণিমার কানে বাজিল, সে চকিতে সৃষ্টির ব্যথাভরা মুখখানির পানে চাহিয়া তাহার ব্যথা বুঝিয়া বলিল, "অনুচিত। বিবাহ পুতুল খেলা বা কেনা-বেচা নয়, এ এক জীবনব্যাপী মহানাটিকা। এর গোড়ায় ভুল হলে আগাগোড়া সেই ভুলের বিষময় অভিনয় চল্‌তে থাকে।"

সৃষ্টি ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমাদের সমাজে বুদ্ধিমান্ বলে যাদের বড়াই তাঁরাও এ সোজা কথাটা বোঝেন না।

তাঁরা ভাবেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ শুধু গৃহধর্ম্ম পালন,—অর্থাৎ স্বামী রোজগার কর্ব্বে, স্ত্রী গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন, রাঁধা বাড়া কর্ব্বে, বস্, জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধন হয়ে গেল। কিন্তু সংসারে উচ্চ জীবন যাপন কর্ত্তে হলে স্ত্রীর কত শিক্ষিত হওয়া দরকার, প্রকৃত সুখ-লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রীর প্রাণ সমসুরে ঝঙ্কৃত হওয়া প্রয়োজন তা তাঁরা ভাবেন না,—ফলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গিনীটিকে যা আশা করা যায় তার কিছুই পাওয়া যায় না,—জীবনটা ব্যর্থ বলে মনে হয়।"

অরুণিমা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্ত্রী আপনার আদর্শানুযায়ী হয় নি বুঝি? আপনাদের সমাজে তা ত হবারও যো নেই। বিবাহ-ব্যাপারে আপনাদের বাপ মায়েরাও শিক্ষিত ছেলের মতামতের অপেক্ষা করেন না ছেলেদেরও পিতৃমাতৃভক্তির আদর্শ এমন, আজীবনের সঙ্গিনী নির্ব্বাচনে নিজেদের স্বাধীন রায় প্রকাশ কর্ত্তে লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে। আমার কিন্তু এ আশ্চর্য্য মনে হয়। সমস্ত বিষয়ে মানুষের একটা পছন্দ না-পছন্দ স্বাধীন মতামত আছে ত। আচ্ছা সৃষ্টিবাবু, আপনার স্ত্রী কি তেমন লেখাপড়া জানেন না? স্কুলে না হয় পড়েন নি।" বলিয়া অরুণিমা লজ্জিত হইয়া পড়িল। সৃষ্টি ভরা গলায় বলিল, "যৎসামান্য ও কিছুই নয়। আপনাদের তুলনায় সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। নিজের কথাগুলিও গুছিয়ে বলতে জানে না। আজ তিন চার বছরে তার পরিচয় পাওয়া গেল না। আমাদের সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এখনো খাদ্য-খাদক গোছের, স্ত্রীরা স্বামীকে ভাবে বাঘ ভালুক এ গোছেরই কিছু।"

অরুণিমা হঠাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সৃষ্টি অরুণিমার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অন্য দিকে চাহিয়াছিল, দেখিতে পাইল না। অরুণিমা সহানুভূতিভরা স্বরে বলিল, "এত লোককে শিক্ষা দিচ্ছেন আপনি, তাঁকেও মনোমত গড়িয়ে নিতে পার্ব্বেন। কাছে নিয়ে আসুন না কেন?"

সৃষ্টি নিরুৎসাহ ভরে বলিল, "সে যো নেই। পাড়াগাঁয়ের সম্বন্ধে আপনার ধারণা নেই, তাকে আন্‌বার উপায় থাক্‌লে ঢের আগেই এনে একবার চেষ্টা কর্ত্তেম। যাক্‌, ও সবের পেছনে অনেক অপ্রীতিকর ইতিহাস আছে, আলোচনায় ফল নেই। আমাদের যেমন দিন-ঠেলা গোছের জীবন সে ভাবেই দিন কাট্‌বে জানি। তবে নিতান্ত সৌভাগ্যে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, জীবনে যেন একটা নূতন আলোর খোঁজ পাচ্ছি।"

সৃষ্টির স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সে থামিয়া পথিপার্শ্বের লোক-চলাচল দেখিতে লাগিল। দু'পাশে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, ফিরিআলারা 'অবাক্ জলপান' 'কুলপি বরফ' বিচিত্র স্বরে হাঁকিয়া যাইতেছিল। অরুণিমার কোমল বুক সৃষ্টির জন্য সমবেদনায় ভরিয়া গিয়াছিল। সৃষ্টির কাতরতা সে ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া লক্ষ্য করে নাই, আজ এই উচ্চশিক্ষিত, মার্জ্জিত কবিটির অস্ফুট হাহারবে সান্ধ্য আকাশটিও যেন উদ্বেলিত বলিয়া বোধ হইল। অরুণিমা আজ বুঝিতে পারিল কেন এই তরুণ-কবির সমস্ত কাব্যে একটি ব্যথার সুরই বাজিয়া যায়, প্রতি লাইনেই তাহার অপরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সন্ধান মিলে।

কিছুক্ষণ সান্ধ্য-আকাশতলে মোটরে পাশাপাশি বসিয়া দু'টি প্রাণী নীরবে ভিন্ন কথা ভাবিতে লাগিল। মোটরের নর্ত্তনে তেম্নি ভাবেই তাহাদের দেহের সংস্পর্শ হইতেছিল, আর সৃষ্টির চিন্তাস্রোত বাধা পাইয়া তাহার দেহের ভিতর দিয়া কেমন একটু বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছিল। মোটর নানাদিক্ ঘুরিয়া এইবার বাড়ীর দিকেই ফিরিয়াছিল। সহসা একটা ঝাঁকুনীতে অরুণিমার একটি হাত সৃষ্টির হাতের উপব পড়িয়া সৃষ্টির প্রাণে একটা অজানা মোহের সৃজন করিল। সৃষ্টি কোমল পুষ্পপেলবতুল্য অরুণিমার হাতখানি সন্তর্পণে ধরিয়া নিমেষেব জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহাব মনের বেলায় তখন সহস্র ঢেউ আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অরুণিমার বুকের মাঝেও লহর উঠিয়াছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু অমন কাতরভাবে সংস্পৃষ্ট হাতখানি সে সহসা টানিয়া লইতে পারিল না।

সৃষ্টির সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল, কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "ভবিষ্যৎটা যদি মানুষ দেখতে পেত, তা হলে অরুণিমা, অনেকের জীবনই বান্‌চাল হয়ে যেত না। কোথায় জীবনের অপরিপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা মানুষ যদি আগে জান্‌ত।"...

সৃষ্টির এরূপ সম্বোধন এই প্রথম। অরুণিমার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল,— চিত্রখানি তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তখানি সৃষ্টির হাত হইতে সরাইয়া লইয়া, কম্পিত দেহ-

খানি পেছনের গদীতে এলাইয়া অরুণিমা মুখ গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, তাহার বুক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে লাগিল।

সৃষ্টি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঐ পাশে প্রায় উপুড় হইয়া রহিল, চোখে তাহার বান্ ডাকিয়াছিল। হর্ণের আওয়াজে সৃষ্টি যখন মুখ তুলিয়া চাহিল, মোটর তখন বাড়ীর গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। অরুণিমা শাল জড়াইয়া সিঁড়িতে যাইয়া দাঁড়াইল। সৃষ্টি না নামিয়া সোফারকে তাহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। অরুণিমার পক্ষ হইতে কোনও কথা শোনা গেল না, মোটর সৃষ্টিকে লইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

(১১)

সুরুচি বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে। বাপ মস্ত জমীদার, দাস দাসী লোকজনের অভাব নাই, কাজেই পিতৃগৃহে তাহার অভাব অসুবিধার কিছুই ছিল না, তবুও এ যাত্রায় পিত্রালয়ে সুরুচির কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইল, কি যেন আশঙ্কায় তাহার বুক অবিরাম দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

সে ধনি-কন্যা, কিন্তু সাধারণ ধনি-কন্যার উপাদানে ভগবান তাহাকে তৈয়েরী করেন নাই। পিতার প্রাসাদতুল্য বাড়ী ছাড়িয়া স্বামীর ভাঙ্গা ঘরে যাইয়াও একদিনের জন্য সে আর দশজন মেয়ের মত নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হয় নাই, বরং অনভ্যস্ত হস্তে হাসিমুখে স্বামি-গৃহের সমস্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু তাহার শাশুড়ী ননদ তাহাকে ভাল চোখে দেখে নাই।

অভিমান-অন্ধ স্বামীটির কাছেও প্রথমটা সে শুধু অবহেলাই পাইয়াছে, তবু তাহার স্বচ্ছ বুকে এতটুকু দাগ পড়ে নাই। গোপন-মন্দিরে প্রেমের মূর্ত্তি গড়িয়া আশার পুষ্পে পূজা করিয়া সে বুক বাঁধিয়া বহিয়াছে। কিন্তু দু'দিনের জন্য নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ স্বাদটুকু পাইয়া সহসা একটা প্রবল ঘূর্ণীবায়ে যখন তাহার জীবন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল তখনো সে কল্পনা করিতে পারে নাই প্রেমময় দেবতাটি তার বিনাদোষে এমনি নির্ম্মম রূপ ধারণ করিবে। আর কেহ হইলে হয়ত বা এ অবস্থায় শাশুড়ীর মুখের দিব্বি না মানিয়া নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য স্বামীকে বিস্তারিত লিখিয়া জানাইত; কিন্তু সুরুচি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে তৈয়েরী। সে ভাবিল, শাশুড়ী যেমনই হউন না কেন, স্বামীর গর্ভধারিণী, পূজনীয়া, তাঁহার শপথ না মানিলে শুধু তাঁহার অবমাননা নয়, সেই অবমাননার গুরুদণ্ড স্বামীকেও স্পর্শিবে। এই সব ভাবিয়া দু'একখানি চিঠি লিখিয়াও সুরুচি তাহা পাঠায় নাই। সে ভাবিয়াছিল মানুষের বিচার যেমনই হউক, ভগবানের বিচারে ভুল নাই, আজ হউক কাল হউক, স্বামী প্রকৃত কথা জানিতে পারিবেন, কিন্তু কেমন করিয়া যে জানিবেন অত শত ভাবিবার প্রয়োজন সে বোধ করে নাই। প্রতিদিন সে স্বামীর চিঠির আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, কিন্তু তাহা যে আর আসিবে না এ কথা তাহার ধারণা করিতে পারিল না।···

এদিকে জমীদার উমাশঙ্কর রায় মানুষের বাইরের খোঁজ রাখিতেন যেমন বেশী, ভিতরের খোঁজ রাখিতেন তেমনি কম।

লাঠির জোরে তিনি প্রজা শাসন করিতেন, ভাবিতেন বুঝি সেই জোরটা সব স্থানে অব্যাহত ভাবে চলে। লাঠি মারিয়া মারিয়া নির্ম্মম বৃত্তিগুলি যেমন বাড়ে, কোমল বৃত্তিগুলি তেমনি কমিয়া আসে; কাজেই মেয়ের প্রাণের খোঁজ তিনি পাইলেন না। বৈবাহিকার অপমান দশগুণ ভাবে ফিরাইয়া দিয়া তিনি স্বগৃহে মেয়ের সব রকম সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু দারুণ অপমানের জ্বালা তথাপি না মিটায় জামাতার খোঁজ অবধি করিলেন না। একটু কোমলভাবে জামাতাকে ব্যাপারটি বুঝাইয়া লিখিলে সহজেই গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু সেই দিক্ দিয়াও তিনি গেলেন না। মেয়েকে নিত্য নূতন শাড়ি, জামা, দ্রব্য সম্ভার আনিয়া দিতেন, এবং বৈবাহিকা ও জামাতার উর্দ্ধতন ও অধস্তন চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারান্তে কহিতেন, "ওদের কথা তুই ভুলে যা মা। খেতে নেই, তার এত দেমাক! ভালই হয়েছে, নৈলে আমিই তোকে নিয়ে আস্‌তাম। ওখানে তোর রাঁধতেও হত—নয়? ঈঃ কি কষ্ট, তাই এত রোগা হয়ে গেছিস্। যাক্ ঐ হতভাগা-গুলোর কথা তুই ভাবিস্ না। কিসের অভাব তোর? যখন যা দরকার আমাকে বল্‌বি, তক্ষুনি এনে দোব।"

কিন্তু কেন যে কন্যার বড় বড় চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া উঠিত অন্তর্দৃষ্টিহীন জমীদারটির তাহা অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না তাঁহার কন্যা আর সেই কচিখুকিটি নাই,—সে এমন সুখের স্বাদ পাইয়াছে যাহার অভাব পিতার সমস্ত বিভব ও স্নেহও পূর্ণ করিতে পারে না।…

সুরুচি ভরা গলায় বলিল, "কাজ কর্ত্তে আমার কোনই কষ্ট হত না বাবা, ওখানে ত বেশ মোটাসোটা হয়েছিলেম। শুধু—" তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল।

উমাশঙ্করবাবু গোল চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "বলিস্ কি রে! মোটা হয়েছিলি ওখানে! বেঁচে যে ছিলি এই ঢের। একে হাঁড়ি ঠেলা, তায় মাগীগুলোর জ্বালাতন! তোর কণ্ঠা বেরিয়ে গেছে রে! কি ভূতেই আমায় পেয়েছিল এত ভাল সম্বন্ধ থাকতে তোকে দিলাম ঐ হাবাতের ঘরে। ঐ হতভাগাটাকে কি চোখে যে দেখেছিলেম। ভুল কিছু করি নি, কিন্তু ওর যত বিদ্যা সে তুলনায় আক্কেল নেই। তোকে ত চিঠি লিখে না, তুই লিখিস্ নাকি?"

সুরুচি অশ্রুভরা মুখখানি মাটির দিকে নামাইয়া নীরবে মাথা নাড়িল।

উমাশঙ্করবাবু প্রীত হইয়া বলিলেন, "ঠিক করিস্ মা, বাপের উপযুক্ত কাজ। জানিস্ কেউ কখনো আমার মাথা নোয়াতে পারে নি, আমার ভয়ে বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়। অমন বাপের মেয়ে তুই।…হাঁ, কখনো কারু কাছে মাথা নোয়াবি না। এমন বন্দোবস্ত আমি কর্ব্ব, কারু কাছে জীবনে তোর কিছুর প্রত্যাশা কর্ত্তে হবে না। স্বাধীনভাবে তোর জীবন পরম সুখে কেটে যাবে।" দুঃখের ভিতরও সুরুচি মনে মনে হাসিল,—পিতা সমস্ত ব্যাপারে জমীদারী চালনা নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন! কিন্তু রমণীর জমীদারীর আইনকানুন, রীতিনীতি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন,—এখানে উচ্চ কথা, রক্ত চক্ষু ও পাইক বরকন্দাজে জমীদারী

ধ্বংস হইয়া যায়,—এখানে চাই শুধু শ্রদ্ধা, প্রেম, অশ্রুজল, সহিষ্ণুতা! সেই পন্থাই ত সে অবলম্বন করিয়াছে, এখন ভগবান্ তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেই হয়। ··

ঐ ভাঙ্গাগৃহের অপমান ও হাঁড়িঠেলার ভিতরই যে সুরুচির নারীজীবনের স্বর্গ, তাহার সজল চক্ষু দু'টিতে উমাশঙ্করবাবু অত শত পাঠ করিতে পারিলেন না। অশ্রু বেদনার বিকাশ, সোজাভাবে এই কথাটাই বুঝিয়া লইয়া তিনি প্রতিহিংসায় দাঁত কড়মড় করিতেন।

সুরুচির মা ছিলেন সোজা মানুষ ও আত্মসুখী,—কবিত্বের ধার তিনি বড় একটা রাখিতেন না। আর একটা মহৎ গুণ ছিল তাহার অতীতের কথাগুলি মুছিয়া ফেলিবার,—তাই সুরুচির বয়সে স্বামীর অদর্শনে তাহার প্রাণে কেমন ব্যথা বোধ হইত, এ বয়সে তাহা আর স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, মেয়েটি কাছে আসাতে তাহার প্রাণ যেমন ভরা ভরা বোধ হয়, তাহাকে পাইয়া মেয়ের প্রাণও তেমনি ভরিয়া উঠিয়াছে,—আর এ সংসারে খাওয়া পরার কোনই অভাব নাই, কাজেই সুরুচির ব্যথা বোধ করিবারও কিছু নাই। সারাটি দিন দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদের স্তোক্ বাক্য শুনিয়া কাটিত, রাত্রিতে মেয়েকে শিশুর মত বুকে করিয়া নিশ্চিন্তে তিনি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেন, —মেয়ে যে মায়ের বুকের ভিতর কি অব্যক্ত বেদনায় ছট্‌ফট্ করিত মাতা তাহা বুঝিতেন না। অনেক জমীদার-গৃহে যেমন হয়, দিনরাত্রিতে স্বামিসাক্ষাৎ লাভ সুরুচির মাতার ভাগ্যে কমই ঘটিত,

এবং চিত্তবিক্ষোভকারী অর্থ ও ভোগবিলাসে ইহা প্রায় সহিয়াই গিয়াছিল, কাজেই পতিবিরহে কন্যাটির বুকে যে রাবণের চিতার ন্যায় ব্যথার আগুন অহর্নিশি জ্বলিতে পারে তিনি ইহা কল্পনা করিতে পারিতেন না।

সুরুচির বৌদিদি মাধবীও শাশুড়ীর আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী হেমশঙ্কর মোসাহেব-পরিবৃত হইয়া কার্য্যে অকার্য্যে বাহিরে বাহিরেই বেশী কাটাইত, কিন্তু তাহাতে মাধবীর আহার-নিদ্রা হাসি-পরিহাসের কোনই ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত না। বেলা নটায় ঘুম হইতে উঠিয়া চোব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয়র যথাবিহিত সৎকার করিয়া কিছুক্ষণের জন্য দাসদাসীমহলে আতঙ্কের সৃষ্টি কবা, তৎপর দাসী-সাহায্যে স্নান ও প্রসাধন এবং আহারান্তে দীর্ঘ দিবানিদ্রা,—বৈকালে আবার কেশ বেশ প্রসাধন, জলযোগ, প্রতিবেশিনীদের স্তোক বাক্য শ্রবণ, রাত্রিতে আহাবের পর আবার দীর্ঘ নিদ্রা—এই ছিল জমীদার বাটীর বৌদের দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা। বাবুরা কোনও রাত্রিতে গৃহে আসিতেন, কখনো বা আসিতেন না, সদরে বা বাগানবাটীতে মোসাহেব-পরিবৃত হইয়া আমোদ-আহ্লাদে কাটাইতেন,—অন্দরে এ সব কথা পৌঁছিলেও মান অভিমান ও কৈফিয়ৎ এর বালাই কোনও পক্ষে থাকিত না, দিন তাই কাটিয়া যাইত চমৎকার! ··

অন্দর সদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে নির্ম্মিত। এদিকে সোপান বাঁধান দীর্ঘিকা, পুষ্পোদ্যান, খাঁচার হরিণ, বিলাতী ইঁদুর, টিয়া, ময়না, সারি ও আরও নানাজাতীয় পাখী। মাধবী

মাঝে মাঝে সঙ্গিনী-পরিবৃত হইয়া এই সব পরিদর্শন করিত, সঙ্গিনীরা ফুল তুলিয়া তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিত,—অলস দিন শ্লথ মন্থর গতিতে চলিয়া যাইত।...

সুরুচি দেখিয়া অবাক্ হইত, ভগবান মানুষকে এরূপ বিভিন্ন উপাদানে কি করিয়া তৈয়েরী করেন! এক সূর্য্য ছাড়া এই হাস্যময় সুন্দর সংসার যেমন অন্ধকার, তেম্নি এক স্বামী ছাড়া রমণীর সমস্তই যে অপূর্ণ, কিন্তু ইহারা সেই স্বামীকে অনায়াসে দূরে দূরে সরিয়া যাইতে দেয়! স্বামীর ঘৃণিত আমোদে ডুবিয়া থাকার কথাটা ভাবিয়াও সুরুচির দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আবার স্বামীর অকলঙ্ক মূর্ত্তি মানস চোখে দেখিয়া লইয়া শ্রদ্ধায় আনন্দে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সুরুচি বিস্মিত হইল মানুষ অর্থ ও বিলাস বিভবটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কিরূপে তৃপ্ত হয়। হায় ইহারা যদি বুঝিত স্বামীর বুকে কুবেরের যে অতুল ঐশ্বর্য্য আছে তাহার কাছে বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ! সুরুচি বুঝিল অর্থই মানুষকে মানুষ করিতে পারে না,—বিদ্যা, জ্ঞান, চরিত্র মানুষকে দেবতা করে, তাই ঐ দরিদ্র স্বামীটির বুকে মাথা রাখিয়া সে যে সুখ পাইয়াছে, মূর্খ ধনী-স্বামীর কাছে সে সুখ পাওয়া অসম্ভব। সেইদিন হইতে সুরুচি স্বামীর আদেশের যথার্থ মূল্য বুঝিল, কে স্বামী তাহাকে লেখাপড়া শিখিবার জন্য অমন অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সুরুচি নিজে নিজে পড়িতে আরম্ভ করিল। প্রথমে অল্প, তারপর দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিল, তাহার মেধা ছিল

অসাধারণ। বাপকে একটা হার্ম্মোনিয়ামের কথা কহিয়া যেদিন সে রাঙা হইয়া উঠিল সেদিন উমাশঙ্করবাবু বেশ খুসী হইলেন। ভাবিলেন, মেয়েটা এইবার ও গুষ্ঠীর দুর্ব্যবহারের জ্বালা প্রায় ভুলিয়া আসিয়াছে। মেয়েটির পাঠপ্রিয়তা তিনি টের পাইয়াছিলেন, তাই কি একটা কার্য্যে কলিকাতা গেলে ফিরিবার সময় একটা ভাল হার্ম্মোনিয়াম, কতকগুলি বাঙ্গালা গল্প ও উপন্যাস এবং আরও রকমারি জিনিস লইয়া আসিলেন।

দিন কয়েক সুরুচির অপটু হস্তের সা রে গা মা-য় বাড়ীর সকলের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। দিন নাই রাত নাই—মেয়েটা খালি হার্ম্মোনিয়ামে গান তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টায় হয়রাণ হইয়া মরিতেছে! উমাশঙ্করবাবু পাগ্‌লী মেয়েটার কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া অস্থির হইতেন, পত্নীকে বলিতেন, "তবু এ ভাবে সুখী হোক্।"

বহু চেষ্টায় যেদিন সুরুচি একটি গান কোনও প্রকারে হার্ম্মোনিয়ামে তুলিল সেদিন তাহার মনে হইল যেন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সে ইষ্টদেবতাটির তুষ্টিসাধন করিতে পারিয়াছে! যাহার তুষ্টির জন্য এই বিপুল সাধনা,—কবে তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে এবং এই যৎসামান্য উপহারে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন কিনা এ ভাবনাগুলিও আনন্দের আতিশয্যে সুরুচি ভুলিয়া গেল। মাধবী নানাপ্রকার ঠাট্টা করিয়াও তাহাকে হঠাইতে পারিল না; সুরুচি তাহার শিক্ষা কার্য্যে এমন করিয়া লাগিল যেন ইহাই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। যদিও জমীদারের অন্তঃপুরে কঠিন অবরোধ

প্রথা ছিল, তবুও আদুরে মেয়েটির তুষ্টির জন্য উমাশঙ্করবাবু এক বৃদ্ধ সঙ্গীতশিক্ষককে কন্যার জন্য নিয়োগ করিলেন। কিছুদিনের ভিতর সুরুচি সঙ্গীত ও বাদ্যে একপ্রকার পারদর্শী হইয়া উঠিল।

পড়াশুনায়ও সে বেশ অগ্রসর হইয়াছিল। উমাশঙ্করবাবু কলিকাতার দিকে গেলে কন্যার জন্য বিবিধ উপহারের সঙ্গে রকমারি বহি লইয়া আসিতেন। একবার যে সব বহি আনিলেন তাহার ভিতর এক সেট আর্য্যনারী ছিল। একদিন দুপুরে তাহারি এক সংখ্যা হাতে করিয়া পড়িবার জন্য সুরুচি মাধবীর ঘরে তাহার পাশে যাইয়া বসিল। ইদানীং গল্প উপন্যাস শুনিবার নেশাটা মাধবীকেও বেশ পাইয়াছিল। মাধবী তখন একগাল পান দোক্তা চিবাইয়া দর্পণে রঞ্জিত অধরের শোভা দেখিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "এসো। দুপুরটা অগত্যা নিদ্রার আরাধনার আয়োজন কচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি সা রে গা মা নিয়ে বস্‌বে।"

সুরুচি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "তুমি কিছুতেই আমায় সার্টিফিকেট দেবে না। এখন আমি অনেক গান বাজাতে পারি জান?"

মাধবী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিল, "সত্যি নাকি? এ সার্টিফিকেট কে দিল, ভোলা কুকুরটা বুঝি?" গ্রামোফোনের গুণগ্রাহী কুকুরের ছবিটি মাধবীর মনে ছিল।

সুরুচি মাধবীর পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "তা ছাড়া আমার গুণগ্রাহী কেউ নেই বুঝি?" মাধবী সুরুচির মুখে বাটা হইতে

একটা পান তুলিয়া দিয়া বলিল, "আছে গো আছে। তারপর আজ কোন্ গল্পটা শোনাবে? ভোম্‌রার গল্প শুনে আমার কিন্তু বড্ড কান্না পেয়েছিল, আঃ অমন মানুষের বরাতে অত কষ্ট। তুমিও আমাদের ভোম্‌রা।" বলিয়া মাধবী এমন ভাবে হাসিল যেন মস্ত একটা উপমা দিয়া ফেলিয়াছে।

সুরুচি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও," কিন্তু অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল। মাধবী তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "বাঃ এ বইগুলো ত দিব্বি বাঁধানো। আর্য্যনারী—আর্য্যনারী মানে কি ঠাকুরঝি? বঙ্কিমবাবুর লেখা বুঝি?"

সুরুচি মলাটের পাতা পড়িয়া বলিল, "না, এ স্মৃতিময়ী রায় সম্পাদিত।"

"স্মৃতিময়ী ত মেয়ে মানুষের নাম। মেয়ে মানুষে লিখেছে!" মাধবী অবাক্ হইয়া বলিল।

"তা মেয়ে মানুষে লিখে বই কি। সহরে আজকাল কত মেয়ে স্কুলে পড়ে, পাস করে, বই লেখে। সবাই ত আর তোমার আমার মত মুখ্যু নয় বৌদি।"

"তুমি ত বেশ পড়তে লিখ্‌তে জান ঠাকুরঝি। তুমিও কেন লিখ না। বঙ্কিমবাবুর মত নাম হবে।"

"দূর পাগল, এ বিদ্যায় কি বই লেখা চলে, সে কত বিদ্যার দরকার।"

"আচ্ছা ঠাকুরজামাই ঢের বই লিখেছেন না? তিনি ত খুব বিদ্বান্। তিনিই বুঝি তোমাকে বই পড়তে বলে দিয়েছেন?

আর এই যে গান শিখ্‌ছ এও তার আদেশ নয় ?” বলিয়া মাধবী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ততক্ষণে সুরুচি আর্য্যনারীর পাতা উল্টাইয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল। প্রথম পাতার কবিতাটির রচয়িতার নাম সৃষ্টিনাথ বসু এম্, এ। তাহার প্রাণে তখন কোন্ হারানো সঙ্গীতধ্বনি পশিয়া সমস্ত দেহে শিহরণ জাগাইয়াছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সুরুচি কবিতাটি গিলিতে লাগিল।

মাধবী একটা শাল জড়াইয়া পাশে শুইয়া পড়িয়া বলিল, “পড় না ঠাকুরঝি। তোমার মুখে ভারি মিষ্টি শোনায়।”

সুরুচির চক্ষু দু’টি সজল হইয়া উঠিল, বাঁ হাতে চোখ মুছিয়া লইয়া ভরা গলায় সুরুচি বলিল, “তাঁর লেখা বৌদিদি।”

“কার—বঙ্কিমবাবুর ? বেশ, পড় শুনি।”

সুরুচি পাতাটি মাধবীর চোখের সাম্‌নে ধরিয়া মনে মনে বেশ একটু গৌরব বোধ করিল। মাধবী কোনও ক্রমে পড়িয়া হাসি-মুখে বলিল, “তা হলে ঠাকুরজামায়ের সাথে আপোষ হয়ে গেছে। বই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার সন্দেশ খাওয়াও ঠাকুরঝি।” একফোঁটা অশ্রু সুরুচির গণ্ড বাহিয়া পড়িল, জড়িতস্বরে সে বলিল, “এমন দিন কি হবে বৌদিদি !”

মাধবী ব্যথিত হইল, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতীর মত বলিল, “তোমারও ভুল হচ্ছে ঠাকুরঝি চিঠি না লেখা। শাশুড়ী দিব্বি কেটেছে বয়েই গেছে, তুমি সমস্ত কথা লিখে জানাও। আর

মেয়ে পুরুষের এক কাগজে লেখাটা আমার বড় ভাল মনে হয় না। কল্‌কাতার সহর খারাপ স্থান।"

সুরুচির মাথাটা হঠাৎ চন্‌ করিয়া উঠিল। স্বামীর নীরব অবহেলায় যে কথা তাহার মনে আদৌ জাগে নাই, বৌদিদির একটি কথায় সহসা ঐ আশঙ্কায় তাহার মন ছাইয়া ফেলিল।

অসুস্থতার ভাণ করিয়া কোনও ক্রমে মাধবীকে এড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে শয্যায় চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া যতই সে স্বামীর কথাগুলি আগাগোড়া আলোচনা করিতে লাগিল ততই তাহার প্রাণে আশঙ্কার কালো মেঘ নিবিড় হইয়া আসিল। ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে একটি আলোর কথা তাহার মনে পড়িল সে পারুল। ক'বৎসর আগে সুকুমারবাবু আলিপুরে ডেপুটি ছিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোনও ক্রমে একটি চিঠি লিখিয়া সুরুচি সেই ঠিকানায় তাহা পাঠাইয়া দিল।

(১২)

ঢালু পাহাড়ের গায়ে একবার পা পিছ্‌লাইলে নীচের খাদ অবধি না গড়াইয়া মানুষ সাম্‌লাইতে পারে না। সৃষ্টিও সেদিন সংযমের বাঁধ হারাইয়া ঐরূপ ঢালুপথেই গড়াইয়াছিল, কোথায় এ তাল সাম্‌লাইতে পারিবে এ বিবেচনাও বুঝি লোপ পাইয়াছিল। পত্নীতে যাহা অপূর্ণ অরুণিমাতে তাহা পরিপূর্ণ, ঠিক যাহা পাইলে তাহার জীবন উপভোগ্য হইত সে সবই যেন সে ঐ তরুণীতে পাইয়াছিল, তাই এই মোহময় যৌবনে অসীম মানসিক

বল সত্ত্বেও সৃষ্টির পা পিছ্‌লাইয়া গেল। অবশ্য স্ত্রী কাছে থাকিলে কতকটা তাহাকে আদর্শানুরূপ গড়াইয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার কতকটা কাটিয়া-ছাঁটিয়া জীবনটা সে একরূপ চালাইয়া লইত; কিন্তু দারুণ দুঃখ ও নিরাশার ভিতর আশার স্নিগ্ধ আলোটি দেখিয়া সৃষ্টিও মূঢ় পতঙ্গের মত সেই শিখা পানে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহিল। সারাটি রাত সুখের ও কল্পনার নেশায় কাটাইয়া রাত্রিশেষে যখন প্রকৃত ঘটনাটা সে ভাবিল তখন একটু লজ্জা ও ধিক্কার জাগিলেও তাহা ক্ষণিকের জন্য। তাহার প্রাণ নেশায় মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, অরুণিমার উষ্ণ স্পর্শ তাহাকে পাগল করিয়াছিল।...

কলেজের কর্ত্তব্য কোনও প্রকারে সারিয়া বৈকালে সে রায় সাহেবের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। আয়নার কাছে সেদিন একটু বেশী সময়ই কাটিল। গেটের ভিতর ঢুকিতে বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, তবুও সে ফিরিয়া আসিতে পারিল না। সিঁড়ির কাছে যাইয়া যখন আরদালীর কাছে শুনিল অরুণিমা কিছুক্ষণ হইল পিতার সহিত মোটরে বাহির হইয়া গিয়াছে তখন সে বড়ই ভগ্নোৎসাহ হইয়া ফিরিল। সে রাতটাও রঙ্গিন নেশায় কাটিল, পরদিন যথাসময়ে সে ঐ বাড়ীতে যাইয়া হাজির হইল, কিন্তু সেদিনও অরুণিমার সাক্ষাৎ মিলিল না। সেদিন সৃষ্টির ভারি অভিমান হইল,—আশ্চর্য্য এমন আকুল হইয়া সে ছুটিয়া আসে আর অরুণিমা কিনা নিষ্ঠুরের মত এ সময়টাই বাহির

হইয়া যায়। রাত্রি জাগরণে ও চিন্তায় শরীরটা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, পরদিন বেশ একটু জ্বর আসিল। রোগশয্যায়ও সৃষ্টি একই চিন্তায় বিভোর রহিল, কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে অরুণিমার প্রেরিত লোকের আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইল।...

সাত দিন পর ভাত পাইয়া একটা রেপার জড়াইয়া দুর্ব্বল দেহেই সৃষ্টি রায়সাহেবের বাড়ী যাইয়া হাজির হইল। বাড়ীটা যেন ছাড়া ছাড়া বোধ হইল, সমস্ত ঘরের দ্বার জানালা বন্ধ। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। দুর্ব্বল দেহে এতটা হাঁটিয়া সৃষ্টি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বারান্দার একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল। দূরে বাগানে একটা উড়ে মালী ঝারিতে করিয়া ফুলগাছেব গোড়ায় জল ঢালিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া ঝারি রাখিয়া, কাছে আসিয়া বলিল, "অবধাড়। দিদিমণিকে অসুখ করিথিলি, মুনিমা সাথে মধুপুর যাউছি।" সৃষ্টির বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মালী জানাইল যে দিদিমণি তাহাকে দিবার জন্য একটি চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাড়ীর ঠিকানা না জানায় সে দিতে পারে নাই। মালী তাহার কাঁধের ছিন্ন মলিন চাদরে বাঁধা একটি খামে আঁটা পত্র খুলিয়া সৃষ্টির হাতে দিল। সৃষ্টির সারা দেহে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলিয়া গেল। কোনও প্রকারে টলিতে টলিতে মেসে ফিরিয়া নিজ কক্ষটির সমস্ত দ্বার সাবধানে বন্ধ করিয়া সৃষ্টি চিঠিখানি একান্ত আগ্রহে পড়িতে লাগিল।

খামের উপর অরুণিমার মুক্তাক্ষরে তাহার নাম। অরুণিমা লিখিয়াছিল, "আপনি যখন সুস্থ হইয়া এ বাড়ীতে আসিবেন, আমরা তখন মধুপুরে। কেন সহসা মধুপুরে আসিলাম, তাহার কারণ না লিখিলেও চলিবে।...সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমাদের প্রথম পরিচয়, তারপর তাহা ভিন্নমুখে চালিত হইয়া নিজেদের কেন্দ্রীভূত করিয়া এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহার পরিণাম হয়ত উভয়ের পক্ষেই অকল্যাণকর। নিজের অভাবগুলি পরিপূরণ করিবার আগ্রহ মানুষের এত স্বাভাবিক যে সেই বৃত্তির বশীভূত হইয়া মানুষ সময় সময় অন্ধ হইয়া পড়ে। মানুষ নিজেকে যতই বলীয়ান্ মনে করুক, এ বিষয়ে বড়ই দুর্ব্বল, অসহায়। আমিও, আপনিও।...

আপনি জীবনে কত চাহিয়াছিলেন এবং কতটুকু পাইয়াছেন তাহা খতাইয়া বুঝিয়া আমি দুঃখিত, কিন্তু সমাজ ও সম্পর্কের বিধান লঙ্ঘন করিয়া সমস্ত আশা পূর্ণ করিবার সাধ্য ও অধিকার কাহারো নাই। বন্ধু হিসাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি,—বাধা না থাকিলে ইহার ফলে হয়ত বা জীবনের স্রোত ভিন্নমুখে বহিত ;—কিন্তু ভগবানের যখন তাহা অভিপ্রেত নয় তখন তিনি তাঁহার অমল আশীর্ব্বাদরূপ যে বিবেকশক্তিদানে মানুষকে তাঁহার অন্যান্য সৃষ্টি হইতে উচ্চ করিয়া গড়িয়াছেন সেই শক্তিটুকুর আশ্রয় লওয়া বিধেয়।...

আপনার যে বন্ধুটির মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের পরিচয়, তাঁহার সমস্ত ইতিহাসই আপনি জানেন। তিনি আজ দূরে না থাকিলে

আমাদের দু'জনার মাঝেও একটা শুভকর ব্যবধান থাকিত। সাধারণ দশজন হইতে উচ্চ বোধশক্তি লইয়াও যদি আমরা অতি সাধারণ কিছু করিয়া বসি, সাময়িক মোহ দূর হইলে তখন দু'জনেই লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিব।·· সেদিন বাড়ী ফিরিয়া তাঁহার চিঠি পাইয়াছি, কি একটা ছুটিতে শীঘ্রই তিনি একবার দেশে আসিতেছেন। তাঁহার চিঠিখানিই আমার অকূলের মাঝে শুক-তারাটির মতো প্রকৃত লক্ষ্য দেখাইয়া দিয়াছে,—সে চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর যেন মন্ত্রপূত। তাঁহার কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়া তাঁহার অমল প্রেমের অপমান না করি আপনার কাছে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা। ··

আমার মনে হয় তীব্র আকাঙ্ক্ষাগুলি থর্ব্ব করিয়া লইয়া প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের ভিতর দিয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইতে পারে, কারণ একই অনন্ত হইতে উৎপন্ন মানুষের ভিতর দিয়া একটি অনাহত সুরই ধ্বনিত হয়, তবে উপাদান ভেদে কোথাও সেই সুর মুখর, কোথাও মূক। কিন্তু সাধকেরা মূক প্রকৃতির ভিতরও অনাদি সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পান। ইহা কবি-কল্পনা নয়, ধ্রুব সত্য।···

আপনি কি উপাদানে গঠিত আমি জানি, আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা আপনার যশঃ চিরদিন অম্লান থাকুক এবং আমাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব চিরদিন জ্যোৎস্নার মত পবিত্র থাকুক।

আপনার স্ত্রী আসিলে তাঁহাকেও বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লইব।

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম। আমার প্রগল্‌ভতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি। ইতি আপনার অকৃত্রিম সুহৃৎ অরুণিমা।”

একবার দুইবার করিয়া সৃষ্টি কতবার চিঠিখানি পড়িল,—চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুফোঁটা ঝরিতে লাগিল,—সৃষ্টি যে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল! তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। চিঠিখানি শ্রদ্ধাভরে দু’হাতে ধরিয়া বক্ষে ও ওষ্ঠে স্পর্শ করিতে যাইয়া সৃষ্টি সহসা থামিল। ন্যায়তঃ সে অধিকার ত তাহার নাই, অরুণিমা যে কিরণের বাগ্‌দত্তা! সংযত ভাষায় অরুণিমা ত সে কথাটুকুই ইঙ্গিত করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ সাধকের মত অরুণিমা সংযমের, ত্যাগের কি কঠোর-সুন্দর কথাগুলিই কহিয়া গিয়াছে। অশ্রুর ফোঁটায় চিঠির স্থানে স্থানে অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে, কি কঠোর ভাবে চিত্ত-বৃত্তির সঙ্গে যুঝিয়া অরুণিমা আত্মদমন করিয়াছে সৃষ্টির বুঝিতে বাকী রহিল না। হৃদয়ের আকুল-করা ব্যথা, ও আবেগের ভিতরও সৃষ্টির প্রাণ অরুণিমার প্রতি ভক্তি-নত হইয়া পড়িল,—এত মহৎ, এত উচ্চ সে! · প্রবৃত্তি মানুষের জন্য চারিদিকেই ত ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই ফাঁদ হইতে যে আত্মরক্ষা করিতে পারে মানুষের মাঝে সে-ই ত দেবতা। ··

অসাধারণ চিত্তজয়ের ক্ষমতা না থাকিলে সৃষ্টি হয়ত সাধারণ উপন্যাসের নায়কোচিত কেলেঙ্কারী করিয়া বসিত, কিন্তু সৃষ্টি সেরূপ কিছুই করিল না। অরুণিমার চিঠিখানি পড়িয়া পড়িয়া ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের অধঃপতনের কথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল, এবং তাহার অতিপ্রিয় অরুণিমাকে মন্ত্রগুরুর আসনে বরণ করিয়া

লইল। বহুক্ষণ চিঠিখানি কপালে ঠেকাইয়া রাখিয়া ভাবের সমাধি হইতে যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন দূরে কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছিল, পাশের বড় বাড়ীটায় পালিত পাখীগুলির কাকলী শোনা যাইতেছিল, নীচের খোলা কল হইতে পিট্ পিট্ করিয়া জল পড়িতেছিল।

শয্যার উপর বসিয়া পূবের খোলা জানালা দিয়া রক্তিম মেঘের পানে চাহিয়া কি ভাবিয়া সহসা স্বস্তি শয্যা হইতে নামিল, তারপর কোণার টেবিলটার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া ড্রয়ার হইতে চিঠির কাগজ লইয়া কলমের উল্টাদিক্ দাঁতে কামড়াইয়া কিছুক্ষণ মুদিতনেত্রে রহিল। যখন সে চক্ষু মেলিয়া দোয়াতটা আগাইয়া লইল চক্ষে তখন একফোঁটা জল ছিল না। সে বাঁ হাতে কাগজ-খানি চাপিয়া লিখিতে লাগিল, "অরুণিমা, দেবতার বাণী মানুষ শুনিতে পায় না, কিন্তু মানুষই সময় সময় সেই অমৃতময় বাণী শুনাইয়া দেয়। তাহা কঠোর হইলেও মাতার শাসনের মত শুভেচ্ছাপূর্ণ। তোমার চিঠিটিতে আমি সেই বাণীই শুনিতে পাইয়াছি, প্রকৃত লক্ষ্যের পানে আমার বেপথুমান মন ফিরিয়া আসিয়াছে,—এ হিসাবে তুমি আমার মন্ত্রগুরু।···

সৌভাগ্যক্রমে তোমার মত উচ্চমনা নারীর বন্ধুত্ব লাভে আমি ধন্য হইয়াছি, নতুবা স্রোতের মুখে হয়ত বা কোন্ ধ্বংসের পানে চলিয়া যাইতাম। তথাকথিত শিক্ষা লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার প্রকৃত গুণ ত আমাকে স্পর্শে নাই, তাই মানুষের প্রকৃত রূপ এখনো চিনিতে শিখি নাই। সেই অনন্ত হইতে উৎপন্ন

মানুষকে অপমান করিয়া এ যাবৎ শুধু তাহার অন্তরস্থিত নারায়ণকেই অপমান করিয়া আসিতেছি . মোহান্ধ হইয়া ক্ষণিক চিত্ত-বৃত্তির অপূরণে হাহাকার করি, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের ভিতরই তিনি তাঁহার স্বরূপটুকু সোণার কালিতে আঁকিয়া রাখিয়াছেন তাহা বুঝিতে, দেখিতে চেষ্টা করি না। তাহা করিলে জীবন এমন চঞ্চল হইত না। নির্লিপ্তভাবে যেদিন মানুষের অন্তরকে ভালবাসিতে শেখা যায় বিশ্বের নারীকে ভালবাসিয়াও সেদিন চিত্ত-চাঞ্চল্য আসে না।···

আমার চাঞ্চল্যের দরুণ তোমার নারীত্বের যে অপমান করিয়াছি সে জন্য আমি যুক্তকরে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি, আমার ঐ অপমানের শাস্তি চিরদিন বহিব না এবং আমাদের পবিত্র বন্ধুত্ব নূতন গৌরবে স্থাপিত হইবে।”

চিঠিখানি বহুবার পড়িয়া খামে আঁটিয়া ডাকে ফেলিয়া সৃষ্টি আজ প্রাণে একটা নূতনতব আনন্দ লাভ করিল,—রাহুগ্রাসমুক্ত হইয়া শশাঙ্কের যেমন আনন্দ হয় তেমি।

সেদিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষে স্কুল কলেজ ছুটি ছিল। দুপুরের আহারের পর সৃষ্টি কবিতার খাতাখানি লইয়া অনেক-গুলি কবিতা লিখিল, প্রত্যেকটিতেই তাহার জীবনের নূতন অনুভূতির রূপ ফুটিয়া উঠিল। আজ সুরুচির মুখখানিও একবার মনে পড়িল, নিতান্ত অশিক্ষিতা হইয়াও যদি সে পিতৃধনগর্ব্বিতা না হইত তবে তাহাকে লইয়া ত সে একটা সুখদুঃখের সংসার

পাতাইতে পারিত। ধনগর্ব্বে মানুষের প্রকৃত রূপটি যে চিরদিন আড়াল হইয়া থাকে।...

বৈকালেও সৃষ্টি নিবিষ্ট মনে লিখিতেছিল, সহসা সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি খাতাখানি বিছানার তলে গুঁজিয়া একটা ইংরাজি বহি মেলিয়া বসিল।

সুকুমারবাবু দুয়ারের বাহির হইতে মাথা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সৃষ্টিবাবু এই ঘরে থাকেন? হ্যালো সৃষ্টিবাবু, ঘরেই আছেন দেখ্‌চি।"

সৃষ্টি মাথা তুলিয়া চাহিয়া সহসা চিনিতে পারিল না, ততক্ষণ সুকুমারবাবু ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিলেন। সৃষ্টি চিনিতে পারিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, "আবে সুকুমারবাবু যে, আসুন, আসুন।" সে উঠিতে উঠিতে সুকুমারবাবু কোণার চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ভাস্কো-ডি-গামার চেয়ে বড় রকম আবিষ্কার করে ফেলেছি। আচ্ছা লোক যা হোক্‌, টিকিটিও দেখ্‌বার যো নেই।"

সৃষ্টি বলিল, "কি রকম? কলেজ করি, সকাল বিকেলে হেদোতে বেড়াই, তবু টিকি দেখ্‌তে না পাবার কারণ তার অভাব।" এ রসিকতা বড় নীরস শুনাইল।

সুকুমারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কবিব সঙ্গে অকবির কথায় আঁটবার যো নেই। কিন্তু একটি মাস হতে চল্‌ল ডায়মণ্ডহারবার থেকে বদ্‌লী হয়ে আলিপুরে এসেছি।"

সৃষ্টি বলিল, "কেন বরাবর আলিপুর ছিলেন না?"

সুকুমারবাবু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "এ বিশ্বাস যদি মহাশয়ের ছিল, তবে দয়া করে এ দীর্ঘ দিনের ভিতর এ গরীবের খোঁজ করা কর্ত্তব্যের খাতিরে উচিত ছিল। আলিপুর এসেই বদ্‌লী হই হুগ্‌লীতে, তারপর ডায়মণ্ডহারবার, তারপর ফের আলিপুর, সাতঘাটের পানি খাবার বদ্‌নাম ত আমাদের আছেই।"

সৃষ্টি অন্যমনস্কভাবে বলিল, "ওঃ! আলিপুরে কবে এলেন?"

"কবিতার জোয়ার মাথায় এসেছে বুঝি? বল্লুম যে একমাস হল এসেছি।"

সৃষ্টি লজ্জিত হইয়া বলিল, "ভারি ঘুম দিয়েছিলেম ছুটি পেয়ে, তার জের এখনো কাটে নি।" সৃষ্টি মিথ্যা কহিতে শিখিয়াছিল।

সুকুমারবাবু বলিলেন, "মাষ্টারদের বড় অলস জীবন। আমার ত ছুটি পেলে ঘুমের কথা মনেও আসে না। খালি খুঁজে বেড়াই কোথায় কে বন্ধু আছে।"

সৃষ্টি পাণ্টাভাবে বলিল, "পরিণাম একই,—তাস পাশা নয় পরের কুৎসা কীর্ত্তন।"

"তবু ঘুমের চেয়ে active ত! তারপর আপনার বোন্‌টি ত 'সৃষ্টিদা সৃষ্টিদা' করে অজ্ঞান। এ ক'দিন আমার ঘরে তেষ্ঠান দায় হয়েছিল। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, সিটি, বঙ্গবাসী কোনও কলেজ বাকী রাখিনি, তারপর আপনার খোঁজে ডিটেক্‌টিভ লাগাব ভাবছি এমন সময় কৃপাময়বাবুর বাড়ীতে আপনার খোঁজ পেলাম। কৃপাময়বাবুকে চেনেন ত?"

সৃষ্টি সহসা ঘামিয়া উঠিল, সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "স্কটিশ চার্চের চাপ্‌রাশীর কাছেই ঠিকানা মিল্‌ত। তারপর কিছুদিন আলিপুরে আছেন ত ?"

"বোধ হয় আছি। বাড়ীতেই কবির সুখদুঃখের সমস্ত আলাপ হবে। এখন বড় তাড়াতাড়ি, অনেক স্থানে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যায় এ গরীবের বাড়ী একবার পদার্পণ করবেন।"

কৃপাময়বাবুর পরিবারের সহিত ইহাদের পরিচয় আছে জানিয়া সৃষ্টি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এড়াইবার জন্য কত হেতুই আনিয়া দাঁড় করাইল, কিন্তু সুকুমারবাবুকে এড়াইতে পারিল না। বাড়ীর ঠিকানা কহিয়া সুকুমারবাবু যখন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন, সৃষ্টির তখন শিষ্টতার কথা মনে পড়িল, বলিল, "বসুন একটু চা-টা। ওরে রাম—"

"জলযোগ আর একদিন" বলিয়া সুকুমারবাবু গট্‌গট্‌ করিয়া নামিয়া গেলেন, যাইবার সময় ঘাড় ফিরাইয়া বলিয়া গেলেন, "কবির বাহন হতে আমাকে যেন আবার আস্‌তে না হয়।"

অগত্যা সৃষ্টিকে যাইতেই হইল। অভ্যাগতের গড্ডলিকা বিশেষ কৃপাময়বাবুর বাড়ীর কাহাকেও না দেখিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুন্দর ছোট্ট দ্বিতল বাড়ীটি. পরিষ্কার তকতকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, টেবিল আরাম-কেদারা, চেয়ারে শোভিত ড্রইং রুমে সুকুমারবাবু ও পারুল বসিয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বাড়ীর চাকরটার প্রদর্শিত পথে এই ঘরে ঢুকিতেই পারুল ও সুকুমারবাবু তাহার অভ্যর্থনা করিল। পারুল হাস্যমুখে

বলিল, "তোমার দেরী দেখে এখনি ওঁকে পাঠাবার যোগাড় কচ্ছিলেম।"

সুকুমারবাবু বলিলেন, "হুকুম কর্ব্বার এমন আজ্ঞাবহ ভৃত্য দুনিয়ায় দু'টি মিলে না ত।"

পারুল সস্মিত নেত্রে স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "যাও, তাই বুঝি। বোস সৃষ্টিদা, অনেক দিন পর তোমায় দেখ্‌লাম। একখানা চিঠি লিখেও খোঁজ কর না। ঈঃ ভারি রোগা হয়ে গেছ যে!"

সৃষ্টি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "হাঁ শরীরটা বড্ড খারাপ ছিল। তারপর তোমরা ভাল ছিলে ত? অনেক নূতন যায়গা ঘুর্‌লে।"

পারুল বলিল, "আর ঘুরে ঘুরে হয়রাণ, ভাল লাগে না। এখন একটা যায়গায় সুস্থির হয়ে বস্‌তে ইচ্ছা করে। দু'টো বন্ধুবান্ধব জুট্‌তে না জুট্‌তেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তা ছাড়া জিনিসপত্রের লোক্‌সান। তোমাদের চাক্‌রীই বেশ, এ সব হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না। তারপর বাড়ীর সব ভাল ত—জেঠাইমা, বৌদি?"

সৃষ্টি একটু চঞ্চল হইয়া বলিল, "এই আছে এক রকম। এ বাড়ীটি ত বেশ, ঘরগুলো বড়, সাম্‌নে একটা বারান্দাও আছে, খোলামেলা। কল্‌কাতায় ভাল বাড়ী যে দুর্ঘট।"

সৃষ্টির চাঞ্চল্য পারুলের নজর এড়াইল না, কিন্তু সে বাড়ীর কথার চেয়ে বাইরের আলোচনাই বেশী করিতে লাগিল, সৃষ্টিও

হাঁপ ছাড়িল। সুকুমারবাবু দেশের কথা, সমাজের কথা, সাহিত্যেব কথা পাড়িলেন, সৃষ্টি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর পাশের ঘরে শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া সৃষ্টি জিজ্ঞাসিল, "ছোট ছেলের কান্না শোনা যাচ্ছে। আর কেউ আছে নাকি ?"

সুকুমাববাবু পত্নীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ওএ বাড়ীব কুড়িয়ে পেয়েছি।"

পারুল রাঙ্গা হইয়া পর্দ্দা সরাইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল, সৃষ্টি ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কি রকম ?"

সুকুমারবাবু গম্ভীব হইয়া বলিলেন, "তা জানেন না বুঝি ? যখন ডায়মণ্ডহারবারে ছিলেম তখন একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আপনাব বোনের ঘবের কাছে কে একটি ছোট্ট ছেলে ফেলে গেছে। আপনার বোন্ বন্ধ্যা মানুষ, সাধ হল দুধেব সাধ ঘোলে মেটাতে। নিয়ে এসেছে, আমিও আপত্তি কবি নি।"

সরল সৃষ্টি বিশ্বাস করিয়া বলিল, "তাই নাকি ? তবু ভাগ্যি ছেলেটাকে আপনাদের বাড়ী ফেলে গিয়েছিল।"

সুকুমাববাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, তা নৈলে হয়ত—"

এমন সময় পারুল একটি মোটাশোটা সুন্দর ছেলে ক্রোড়ে এই ঘবে ঢুকিয়া সলজ্জ হাস্যে বলিল, "এ বাড়ীর নূতন লোকটিব সাথে ত তোমাব আলাপই হয় নি, নন্তু এর নাম। যাও নন্তুবাবু তোমাব মামাবাবুর কোলে যাও।"

সৃষ্টি হাত পাতিলে ছেলেটি হাসিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "মাম্মাবু।"

সৃষ্টি তাহাকে আদর করিয়া পারুলকে বলিল, "বেশ ছেলেটি কুড়িয়ে পেয়েছিস্।"

পারুল অবাক্ হইয়া বলিল, "কুড়িয়ে পেয়েছি কি রকম? ওঃ তুমি ভারি সোজামানুষ সৃষ্টিদা! ওঁর কথা তুমি বিশ্বাস করেছ! উনি ত খোকাকে কুড়ান ছেলেই বলেন।"

সুকুমারবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কুড়ান ছেলে বই কি, ভগবানই ত একদিন ভোরে একে তোমার কোলের কাছে ফেলে দিয়েছেন।"

সৃষ্টি বুঝিতে পারিয়া উচ্চহাস্যে বলিল, "ভারি দুষ্টু সুকুমারবাবু। এম্নি গম্ভীর হয়ে কথাগুলি বল্লেন আমি ভাবলাম সত্যি বা, আর এমন সংবাদ খবরের কাগজেও মাঝে মাঝে পড়ি। বাঃ দিব্বি ছেলে হয়েছে ত!"

নন্তুবাবু ততক্ষণ সৃষ্টির চস্‌মা লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছিল। সৃষ্টি চস্‌মা জোড়া খুলিয়া তাহার নাকে পরাইয়া দিতে সে হাসিয়া আধ আধ স্বরে বলিল, "বাবু।" চস্‌মা চোখে দিলে বাবু হয় সে বুঝিত।

সুকুমারবাবু নন্তুবাবুকে বলিলেন, "চেপ্টা নাকে চস্‌মা আঁটা গুরুমহাশয়।"

নন্তুবাবু পুনরাবৃত্তি করিল "গুলু মাতা চম্মা তা।"

পারুল বুঝাইয়া বলিল, "গুরুমশায় চস্‌মা আঁটা।" ছেলের

অস্ফুট কথাগুলি সে বুঝিত। সস্নেহে বলিল, "তুমি তোমার মামাবাবুর মত গুরুমশায় হবে নন্তবাবু ?"

নন্তবাবু চস্‌মা চোখে দিয়া প্রীত হইয়া আনন্দের সহিত মামার চক্‌চকে স্বর্ণচেইন উপাদেয় আহার্য্য জ্ঞানে লেহনে ব্যাপৃত হইয়াছিল, মায়ের প্রশ্নের একটা যথোচিত উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া বলিল, "মাম্মা গোউ।"

পারুল কৃত্রিম ভৎ´সনা করিয়া বলিল, "গরু নয় গুরু, বোকা ছেলে।"

নন্তবাবু মায়ের ভৎ´সনার মূল্য বুঝিত, কুন্দদন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "মাম্মা বকা।"

পারুল হাসিয়া বলিল, "তুই আস্ত গাধা।"

খোকাবাবু খেলা পাইয়াছিল, বলিল "মাম্মা গাগা।"

সুকুমারবাবু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ঠিক বলেছে, গুরুমশায়রা গরু, বোকা, গাধা।" তিনি হাত বাড়াইলে খোকাবাবু তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মায়ের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, যেন সে জিতিয়াছে, মা হারিয়াছে।

সৃষ্টিনাথ অতৃপ্তনয়নে এ দৃশ্য দেখিতে লাগিল, বুঝিবা এমন একটা সুন্দর ছবির অভাবও সে অনুভব করিল।

সুকুমারবাবু সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিতে নন্তবাবু কচি হাতে বাপের দাড়ি ধরিয়া অন্য হাত মায়ের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "মা কাও।" সুকুমারবাবু হো হো করিয়া হাসিলেন, পারুল রাঙ্গামুখে ছুটিয়া পলাইল।

আহারাদির পর তিনজনে ড্রইং রুমে বসিয়া নানারকম গল্প-গুজব করিতে লাগিল। পশ্চিমা আয়াটা হিন্দী ও বাঙ্গ্লা মিশ্রিত গল্প শুনাইয়া নন্তবাবুকে পাশের ঘরে ঘুম্ পাড়াইতেছিল। কিছুক্ষণ গল্পের পর পারুল একবার স্বামীকে চোখের ভাষায় কি যেন কহিল, এ নীরব ভাষা উহারা পরস্পর ভিন্ন অপর কেহ বুঝিতে পারিত না, সৃষ্টি বুঝিল না। সুকুমারবাবু সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া সৃষ্টিনাথকে কহিলেন, "আপনারা ভাই বোনে ততক্ষণ আলাপ করুন, আমার একটা বড় মাম্লার রায় লিখ্তে হবে, কাল্কে রায় না দিলেই নয়।"

সৃষ্টি বলিল, "বাঃ দিব্বি ত, আমি হলেম অতিথি, অতিথির চেয়ে রায় বড় হল ?"

সুকুমারবাবু গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া কহিলেন, "ওঃ তা জানেন না বুঝি ? কলিতে ব্রহ্মা অধিকাংশ বাঙ্গালী সৃষ্টি কর্ব্বার সময় তার কানে তিনটি মন্ত্র দিয়ে দেন। প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় চাক্‌রী, তৃতীয় উপরিআলা। বাঙ্গালী আজীবন এই তিনটি মন্ত্র প্রাণপণে জপ করে! ধর্ম্ম কর্ম্ম, পিতা মাতা, দেশমাতৃকা কিছুই এর কাছে নয়।"

সৃষ্টি ও পারুল হাসিল। সুকুমারবাবু বলিলেন, "সময়ান্তরে আপনার সঙ্গে কাব্যচর্চ্চা কর্ব্ব। গুরুমশায়রা সাধারণতঃ ক্ষমাশীল

হয়ে থাকেন আশা করি, আমার এ বেয়াদবী সে ক্ষমাশীলতার ব্যতিক্রম ঘটাবে না।"

স্বষ্টি বলিল, "তবু ভাল হাকিম প্রভুরা আমাদের সম্বন্ধে অতটুকু উচ্চধারণা পোষণ করেন।"

পারুল নিম্নস্বরে বলিল, "বাবা কি চাকরী, বাড়ী এসেও এ গোলামীর জের যায় না! তোমাদের বোধ হয় এমনতর নয় স্বষ্টিদা।"

সুকুমারবাবু শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন. জরুরী মোকদ্দমা হাতে থাকিলে শয্যা আশ্রয় করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে দীর্ঘরাত অবধি তিনি রায় লিখিতেন।

পারুল নানা প্রসঙ্গের পর আস্তে আস্তে বাড়ীর প্রসঙ্গ তুলিল এবং সুরুচির অজস্র প্রশংসাবাদ করিল।

শাশুড়ী স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সেবা-পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণাবলীর ব্যাখ্যা করিয়া কহিল, "যাই বল স্বষ্টিদা, শুধু তোমাদের বাড়ীতে পড়েই অমন লক্ষ্মী মেয়েটা প্রশংসা পেল না, সুখী হল না। জ্যেঠাইমার বড্ড সেকেলে ভাব, তাঁর মন্ত্রীও হয়েছে সুমতি আর গাঁয়ের বিশ্ব নিন্দুকের দল,—ভালকে নির্য্যাতন করাই যাদের জাত-ধর্ম্ম। জ্যেঠাইমার তার ওপর প্রধান রাগের কারণ তাঁর কথাতেই আমি বুঝেছি, তোমার শ্বশুর তার ভাণ্ডার তোমাদের লুটিয়ে দেয় না। এ অন্যায় দাবী বাপু। বিয়ের সময় ত কম দেয় না। কিন্তু দাবী করাই যার স্বভাব কে তাকে খুসী কর্ত্তে পারে? তোমাদেরও মেয়ে হবে,

তখন বুঝ্‌বে ও-পক্ষ অবুঝ্‌ হলে কি কষ্টটাই ভুগ্‌তে হয়। শাশুড়ীর গঞ্জনা সইতে না পেরে আজ কাল কত মেয়ে আত্মহত্যা কচ্ছে। তোমাদের এ মাতৃভক্তিও অন্ধ, আমি এর প্রশংসা করি না। সব দিক্‌ বজায় রেখে যে চল্‌তে পারে সেই বিবেচক, বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানী। তোমরা ভিতরের খোঁজ রাখ না, রাখ্‌তে চেষ্টাও কর না। জেঠাইমার সঙ্কীর্ণতার সমর্থন আমি করি না।"

সৃষ্টি বোধ হয় একটু বিরক্ত হইয়াছিল মায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ গায়ে-পড়া সমালোচনায়, সে নীরব রহিল। পারুল বলিল, "রাগ কর্ল্লে সৃষ্টিদা? একটু ভেবে দেখ, এতে রাগ কর্ব্বার কিছু নেই। মা বলে তাঁর সবই ভাল, কোনও দোষ নেই, এটা কাজের কথা নয়। তা ছাড়া একজন উৎপীড়ক যদি একজন নির্দ্দোষকে খালি মেরেই যায়, অন্ধভক্তির দোহাই দিয়ে উৎপীড়ককে কিছু না বলে অন্ততঃ উৎপীড়িতকে দু'টি মিষ্টি কথা কয়ে তার ব্যথার সান্ত্বনা দিলে ত আর ভক্তির কোনও হ্রাস হয় না। মনে করো না সৃষ্টিদা, বাইরের লোক হয়ে আমার তোমাদের ঘরের কথার সমালোচনা কর্ব্বার মাথা ব্যথা কেন? আমি এবার বেশ করে দেখে এসেচি, কি নীরবে বৌদি সমস্ত যাতনা সয়ে যায়, আমি ত পার্ত্তাম না। তবু একটি দিন সে মুখ ফুটে আমায় কিছু বলে নি। তোমায়ও কিছু জানায় নি বোধ হয়।"

সৃষ্টি তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "এ কথা যদি বা বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌তাম কিন্তু সে যো নেই।"

পারুল অবাক্‌ হইয়া বলিল, "কেন? শুনি কিসে?"

সৃষ্টি তেমনি ভাবে বলিল, "ও যাত্রায় তার সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা আমি নিয়ে এসেছিলেম সব বদ্‌লে গেছে। মানুষ এত ছদ্মবেশী হতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারি নি। পিতৃধন-গর্ব্বিতা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা সে। যাক্ এ সব অপ্রীতিকর আলোচনায় ফল নাই। অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে দেখা, ভাল কথা কও।"

পারুল বলিল, "সে যাত্রার পরিচয়েও তুমি তার হৃদয়ের খোঁজ পাবে না আমার কিন্তু এ ধারণায় আসে নি, সৃষ্টিদা। সত্যি সৃষ্টিদা, তোমরা পুরুষগুলো বড্ড ভাবপ্রবণ। স্ত্রীলোকদের তোমরা কি যে ভাব, মাথায় তুল্‌তেও দেরী নেই, আবার পায়ের তলায় পিষে মার্‌তেও সময় লাগে না।·· মানুষের চোখ দু'টির ভেতরই ত তার অন্তরের সমস্ত খোঁজ পাওয়া যায়। · সে যাক্ তোমার অভিমান ও বিরাগের খোঁজ আমি অনেকটা রাখি। কতদিন তার চিঠি পাও না?"

"সে হিসাব রাখ্‌বার প্রয়োজন মনে করি নি।"

পারুল বলিল, "আচ্ছা সৃষ্টিদা, বাপ বল, ভাই বল, অর্থ বল, স্বামীর কাছে মেয়েদের কি আছে? প্রথম স্বামী তার পর আর সব-এক সূর্য্য ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় তেমন স্বামী ত্যাগ কর্‌লে নারীর সমস্ত সুখই লোপ পায়, এ অতি সত্যি কথা, এবং এ কথা বারো বছরের একটি মেয়েও যেমন বোঝে তোমাদের মত বিজ্ঞ পুরুষেও তা বোঝে না। তাই অনেক দিনের ভেতরও তুমি তার নীরবতার কারণ বুঝ্‌তে চাও নাই, যদি চাইতে তা হলে এমন

নিষ্ঠুর ভাবে তাকে পায়ে দলে মৃত্যুমুখে তুলে দিত পার্ত্তে না। উঃ কি নিষ্ঠুর, অবিবেচক তোমরা।" বলিতে বলিতে পারুলের কণ্ঠরোধ হইল।

সৃষ্টি চমকিয়া বলিল, "তার মানে?"

পারুল চোখের জল মুছিয়া বলিল, "বেশী দিন বোধ হয় সে বাঁচ্‌বে না শাশুড়ী ননদের জ্বালাতন, বিনা দোষে পিত্রালয়ে নির্ব্বাসন এবং তোমার অবহেলা, উপেক্ষা, সে সইতে পার্ত্ত যদি সে এতটুকুও দোষী হত কিন্তু নির্দ্দোষীর প্রাণ যে কোমল ফুলটির চেয়েও নরম। সতী স্ত্রী সব সইতে পারে, কিন্তু প্রিয়তম স্বামীর উপেক্ষা সইতে পারে না। শুন্‌বে তোমার মা ও বোন কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করেছে।"

পারুল সুরুচির নির্ব্বাসনের প্রকৃত ইতিহাস অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া গেল।

সৃষ্টি সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু পারুল তাহার বাক্স হইতে সুরুচির চিঠি দু'টি আনিয়া দেখাইল। পড়িয়া সৃষ্টির চক্ষু হইতে কালো পর্দ্দাটা সরিয়া গেল, সুরুচির প্রকৃত রূপ চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল। কি আর্ত্তনাদভরা চিঠিখানি, প্রতি লাইনে কি বুকভাঙ্গা হাহাকার! সুরুচি একস্থানে লিখিয়াছিল, "ঠাকুরঝি, তিনি লেখাপড়া ভালবাসেন, লেখাপড়া না জানিলে নাকি মানুষ হৃদয়ের কথা ভাল্ বুঝিতে, বুঝাইতে পারে না। তিনি গান ভালবাসেন, গানে নাকি ঘুমন্ত প্রাণটিকে জাগাইয়া দেয়। তিনি আরো অনেক চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নির্গুণ

আমি তাঁহার কোনও সাধই পুরাইতে পারি নাই,—ভগবান মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিপূরণের ব্যবস্থা করেন নাই কেন তাহা তিনিই জানেন। আমার নির্গুণতার জন্য আমি দুঃখিত নই, কিন্তু তাঁকে যে সুখী করিতে পারি নাই এজন্য দুঃখিত।...আমার এ নির্ব্বাসনের অনন্ত যাতনার ভিতর এটুকু তৃপ্তি যে তাঁর প্রিয় গুণগুলি কতকটা আয়ত্ত করিয়াছি, এবং ইতিমধ্যে মৃত্যু হইলে এইটুকু তৃপ্তি লইয়া মরিতে পারিব।·· ব্যথা যখন অসহ্য হয় নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে প্রাণের কথাগুলি লিখি, কিন্তু চিঠি ডাকে দিতে হাত সরে না, পাছে ওঁর মায়ের দিব্বি কালসাপের মত ওঁকেই বেড়াইয়া ধরে, আমি যে নিজের কারায় নিজেই বন্দী :হইয়া পড়িয়াছি।...সমস্ত চিঠি আমি যত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখি, আমার অন্তিম-মিলনে কণ্ঠ যখন কহিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে হয়ত বা এই লেখাগুলি আমার শেষ কথা তাঁহাকে নিবেদন করিবে।...”

আর একখানি চিঠিতে সুরুচি লিখিয়াছে “ঠাকুরঝি, পাঁচ দিন পূর্ব্বে তোমাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছি। সেদিন রাত্রিতেই প্রবল জ্বর হইয়াছিল, দু’দিন অজ্ঞান হইয়াছিলাম। আজ জ্বর একটু কম, কিন্তু বিছানা ছাড়িবার শক্তি নাই, তবু বালিসে ভর করিয়া এই ক’ লাইন তোমাকে লিখিতেছি। মাথা ঘুরিতেছে, হাত কাঁপিতেছে, গুছাইয়া লিখিবার শক্তি নাই। তবু লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে, কারণ বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছে।...

সদর হইতে ডাক্তার আসিয়াছিলেন, বলিলেন, দীর্ঘ দিনের মানসিক অবসন্নতায় আমার জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে।

পৃথিবীতে বুকের খোঁজ কেউ রাখে না, তাই মা বাবা চিকিৎসায় অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু আসল রোগ কোথায় তাঁহারা বোঝেন না। তাঁহারা হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য শীঘ্রই আমাকে পুরী লইয়া যাইবেন। এতদিন আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম হৃদয়ের আকুল স্পন্দন প্রিয়র হৃদয়ে যাইয়া পৌছে, কিন্তু জন্ম জন্ম কি যে পাপ করিয়া আসিয়াছিলাম শেষ সময়ের আশাটুকুও পূর্ণ হইল না।···জমিদারগণ যে কি উপাদানে গঠিত আত্মাভিমানে তাঁহারা স্নেহের মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন,—তাই চিকিৎসার জন্য কলিকাতা ছাড়াইয়া আমাকে যাইতে হইবে সমুদ্রতীরে। ভালই হইবে, এক অনন্ত হইতে মানবের উৎপত্তি আর এক অনন্তে বিলয়।···নারী তার প্রিয়কে অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে পারে সত্য, কিন্তু সে সঙ্গে সে আর একটি অনুষ্ঠান করে, তা নীরব আত্মবিসর্জ্জন !···

পুরী, সাগরতীব, সিন্ধুনিবাস, এই ঠিকানায় আমায় চিঠি দিও।"

বাড়ীর ঠিকানা না জানায় সুরুচি চিঠি আলিপুব কোর্টের ঠিকানায় লিখিয়াছিল।

চিঠি পড়িয়া সজলনয়নে সৃষ্টি যথন চক্ষু তুলিল পারুলের চক্ষুও তখন শুষ্ক ছিল না। সে বলিল, "সৃষ্টিদা, আলেয়ার অনুসন্ধানে যেয়ে পেছনের শুকতারাটির খোঁজ তুমি কর নাই। আমরা জানি,

সেও জানতে পেরেছে, কারণ নারীর অন্তরের চোখ দু'টিতে ফাঁকি দেওয়া চলে না। তাই তার এ নীরব আত্মবিসর্জ্জন। কিন্তু তুমি যে সুরের হাওয়ার পেছনে ঘুরে মর্ব্বে সে কল্পনা আমি করি নি। রাগ করো না, ঐ নেশাটা তোমার বিচারের ক্ষমতা লোপ করেছিল। মা বোনের প্রকৃতি জেনে শুনেও তাদের মিথ্যা অভিযোগ তাই তুমি সত্য বলে ভেবেছিলে, অথবা কিছুই ভাব নি, আত্মসুখে লালসা তোমার এত প্রবল হয়েছিল।"...

সৃষ্টি নীরবে মাথা গুঁজিয়া রহিল, এ অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করিল না, বুকে তাহার অনুতাপের আগুন জ্বলিয়াছিল।

পারুল বলিতে লাগিল, "কত খোঁজ করে তবে তোমার সন্ধান পেয়েছি। হয় ত বা তুমি বিরক্ত হবে তাই অনেক গুছিয়ে তোমাকে কথাগুলি জানাতে হচ্ছে। এখনো সময় আছে। আমি টেক্সির বন্দোবস্ত করে রেখেচি। তুমি এখনি হাবড়ায় রওনা হয়ে যাও, তার কামনা অতৃপ্ত রেখ না, তা হলে তার আত্মা চিরদিন হাহাকার করে বেড়াবে।" পারুল ব্যথায় কাঁদিয়া ফেলিল, সৃষ্টিও নিজেকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া দু-হাতে মুখ ঢাকিল।

সুকুমারবাবু গম্ভীর মুখে আসিলেন তিনি সমস্ত জানিতেন। ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেরী নয়। এই বেলা বেরিয়ে পড়া দরকার। ভাব্‌বার যথেষ্ট সময় আছে। আসুন সৃষ্টিবাবু।"

তিনি ছোট্ট একটি ব্যাগে সৃষ্টির জন্য আবশ্যকীয় কিছু কাপড় চোপড় গুছাইয়া আনিয়াছিলেন।

সুকুমারবাবু সৃষ্টিনাথকে নীরবে টেক্সিতে তুলিয়া দিলেন।

(১৪)

সকালবেলা পুরীর সিন্ধুনিবাসের উপরের ঘরটিতে বিছানায় পড়িয়া রুগ্না সুরুচি উদাস নয়নে সাগরের পানে চাহিয়াছিল। রক্তহীন শীর্ণ দেহ, চক্ষু জ্যোতিঃহীন, মন্দ বাতাসে রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর উড়িয়া পড়িতেছিল। শয্যাপার্শ্বে টবিলের উপর রাশি রাশি ঔষধের শিশি, বেদানা, আঙ্গুর। মাধবী বিছানার একপাশে বসিয়া একটা গ্লাসে আঙ্গুরের রস নিংড়াইতেছিল।

অদূরে গম্ভীর গর্জ্জনে অনন্ত সমুদ্র নাচিতেছে, ফেনময় ঢেউগুলি সমুদ্রতটে ভাঙ্গিয়া রকমারি ঝিনুক ও প্রবালাদি ছড়াইতেছিল। সবুজ প্রাণের অবুঝ আনন্দ-বিভল কতকগুলি বালকবালিকা মহোল্লাসে সেই সব আহরণ করিতেছিল। তাহাদের কেশপাশ ও বসন প্রান্ত লইয়া উতলা-বাতাসের দুরন্ত-পনার শেষ ছিল না।—

সুরুচি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "মানুষের জীবন এই ঢেউগুলির মত অনন্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে সংসারের তীরে এম্নি ছুটে আসে, আবার নিমেষে ভেঙ্গে অনন্তে মিশে যায়। কোনটা বা সংসারকে মহামূল্য মণিমুক্তা দিয়ে যায়, কোনটা বা ঝিনুকের চেয়ে দামী কিছু দিতে

পারে না।... আচ্ছা বৌদি মেয়েমানুষগুলার জীবনের সার্থকতা কি, পৃথিবীর একজনকেও তারা সুখী কর্ত্তে পারে না?"

মাধবী ইতিমধ্যে সুরুচির শিয়রে হইয়াছিল, বলিল, "ভগবানের সকল কাজেরই একটা সংকল্প নিশ্চয় আছে ঠাকুরঝি। পরোক্ষ ভাবে, প্রত্যক্ষ ভাবে সবাই তাঁরই শৃঙ্খলায় সহায়তা করে। তবে আমাদের জ্ঞান অল্প, তাই বুঝ্‌তে পারি না।"

সুরুচি নীরবে ভাবিতে লাগিল। বাহিরের মত তাহার বুকেও অনন্ত লহর উঠিতে পড়িতেছিল।

মাধবী আঙ্গুরের রস সুরুচির শীর্ণ ওষ্ঠের কাছে ধরিয়া বলিল, "খেয়ে ফেল। আজ কেমন বোধ কর ঠাকুরঝি?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আর বোঝাবোঝি নেই বৌদিদি, এখন খালি একটি প্রতীক্ষা করে আছি, তাই এ ওষুধ-গুলো খাই। জীবনের অনেক বাঁধন থেকে ছিন্ন হয়েও কি অসম্ভব আশায় যে এখনো বেঁচে আছি নিজেই বুঝ্‌তে পারি না।" সুরুচির গভীর-দীর্ঘশ্বাসের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া মাধবী ব্যথিত হইল, বলিল, "ভয় কি সেরে উঠ্‌বে, মানুষের আকুল আকাঙ্ক্ষা ভগবান অপূর্ণ রাখেন না।"

সুরুচি এক চুমুকে রসটুকু পান করিয়া চক্ষু বুজিল, তারপর সহসা একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "ঠিক বলেছ বৌদি! মাঝে মাঝে কে যেন আমার কানে তোমার এ কথাগুলি কয়ে যায়।" তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার মনে হয় বৌদি, ধনাভিমানী জমিদার ঘরে জন্মগ্রহণ করা একটা অভিশাপ।" কি গভীর দুঃখে

সুরুচি এ কথা কয়টি কহিল মাধবীর তাহা অজ্ঞাত রহিল না, সে নীরবে তাহার রুক্ষচুলে আঙ্গুল চালনা করিতে লাগিল।

নীচের কোলাহলের ভিতর একটা গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। সুরুচি বলিল, "কিসের শব্দ বৌদিদি ?" এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শোণিত বিকাশ হইল। মাধবী জানালা দিয়া নীচে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু বলিল, ও কিছু নয়, পাশের বাড়ীতে কেউ এল বুঝি।"

"ওঃ" বলিয়া সুরুচি চক্ষু মুদিত করিল। পথ্য লইয়া আসিবার ছুতায় মাধবী ত্বরিতে নীচে নামিয়া গেল।

গাড়ীতে যে আসিয়াছিল সে সৃষ্টিনাথ। নীচে দাসদাসী মহলে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। মাধবী নীচে যাইয়া তাহাদের থামাইল পাছে এ হট্টগোল উপরে পৌছে সে জানিত আকস্মিক উত্তেজনায় সুরুচির ক্ষীণ প্রাণটি যে কোনও মুহূর্ত্তে-বাহির হইয়া যাইতে পারে।

এক রাত্রির ভাবনায় সৃষ্টিনাথ যেন আধখানা হইয়া গিয়াছিল, আত্মানুশোচনা অতি কঠোর ভাবে তাহার দেহের উপর দিয়া নির্ম্মম হস্ত বুলাইয়াছিল। জমীদার উমাশঙ্কর তাহার অভ্যর্থনা করিলেন না, মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। সৃষ্টির তখন এ সব বুঝিবার দেখিবার অবসর ছিল না, সে সরাসর অন্দরে ঢুকিয়া মাধবীকে আকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি জান্‌তে চাই বৌদি সে বেঁচে আছে কিনা, গাড়ী বিদায় করি নি।"

মাধবী আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় নেই, বেঁচে আছে। আপনি

বিশ্রাম করুন। হঠাৎ দেখা হওয়াটা ঠিক নয়। আগে সাবধানে তাকে আপনার খবর দি।”

সৃষ্টি একটু আশ্বস্ত হইয়া নীচে পায়চারি করিতে লাগিল।

মাধবী উপরে যাইয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, সুরুচি মেঝেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া গোঙাইতেছিল। মাথায় বাতাস করিয়া, আঙুরের রসে সুরুচিকে একটু সুস্থ করিয়া মাধবী ঈষৎ ভর্ৎসনা করিল, “এ দুর্ব্বল শরীরে কেন জানালার ধারে গিয়েছিলে ঠাকুরঝি?”

সুরুচি কাঁদিয়া বলিল, “না গিয়ে যে পারি নি বৌদি। আজই ত তাঁর আস্‌বার দিন।…একবার নিয়ে এসো তাঁকে এখনকার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত আমার এত মূল্যবান্ যে একটিও নষ্ট হলে জন্মজন্মান্তরে তার ক্ষতি পুরণ হবে না।” অতি সাবধানে তাহাকে শয্যায় আনিয়া মাধবী খানিকটা আঙ্গুরের রস পান করাইল।

সৃষ্টি যখন নতমুখে এই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল অস্তগামী সূর্য্যের শেষরশ্মির মত ম্লান আভা তখন সুরুচির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালনখরছিন্ন পদ্মিনীবৎ সুরুচির হতশ্রী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া সৃষ্টির কণ্ঠ ঠেলিয়া বিশ্বের হাহাকার ঠেলিয়া বাহির হইল,—তাহারি অবিশ্রান্ত অনাদরে এই পুষ্পটি এমনি অকালে শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া।

সুরুচি একবার মাধবীর দিকে চাহিল সে অর্থ বুঝিয়া একটা ছুতা করিয়া মাধবী নীচে চলিয়া গেল। সুরুচি ক্ষীণ কণ্ঠে স্বামীকে নিকটে আসিতে বলিল।

সৃষ্টি বসিয়া তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "কেন এ ভাবে আত্মবিসর্জ্জন কোর্চ্চ সুরু ?"

সুরুচি সে কথার উত্তর করিল না, বলিল, "তুমি আস্‌বে আমি জানি। অনেক কথা তোমায় বল্‌বার ছিল, না বল্লে বোধ হয় তৃপ্তি হত না, তাই ঠিক আজকেই তোমার আসা হল।"

সৃষ্টি আকুল হইয়া বলিল, "এমন করে সীমা টেনে দিও না সুরু, বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র আমার সাম্‌নে, আগে সবগুলো প্রায়শ্চিত্ত আমায় কর্ত্তে দাও। আমার সমস্ত ভুল আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, একটি একটি করে সমস্ত ভুল সংশোধন কর্ব্ব। মানুষের অন্তরের ভিতর যে অনাহত সুরের হাওয়া বয়ে যায় অন্ধ হয়ে এতদিন তা বুঝ্‌তে না পেরে ভুলপথেই আমি চলেছিলাম, এবার প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছি সেরে ওঠ সুরু, তোমায় আমায় একটা সুখের সংসার গড়ে তুলি।"

সুরুচি হাসিল, সে হাসি বড়ই মর্ম্মান্তিক। বলিল, "এ কথা যদি আগে শুন্‌তেম। যাক্‌, আমার কথাগুলো আগে শেষ কর্ত্তে দাও। আমার আত্মাব সম্বন্ধেও তুমি একটা ভুল ধারণা পোষণ কর্ব্বে তা যেন আমি সইতে পাচ্ছিলাম না।...আমার সম্বন্ধে যে সব অপবাদ তুমি শুনেছ তা ভুল, তোমার স্নেহের উপহারের আমি অপমান করি নি, কেউ তা পারে না, কারণ নারী স্বামীর উপহার ওজন করে না, অনুভব করে। তোমার যারা আপন তাদের অপমান থেকে আমার যিনি আপন তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে যদি কোন অপরাধ করে থাকি তার দণ্ড ত যথেষ্ট পেয়েছি, আর দিও না,

এই মিনতিটুকু জানাবার জন্য এই দীর্ঘদিন তোমার প্রতীক্ষা কর্চ্ছিলাম। বল ক্ষমা কর্ব্বে।” কাঁদ কাঁদ ভাবে সৃষ্টি বলিল, “আর ওসব কথা বলো না, আমি সব শুনেছি, পারুল আমায় সব বলেছে। সেরে ওঠ, সেরে ওঠ লক্ষীটি আমার।”

স্বামীর সেই রোদন জড়িত স্বর সুরুচির সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা ও অভিমান মুহূর্ত্তে জল করিয়া দিল।

আবেগভরে সে বলিল, “এতদিন নিরন্তর মৃত্যুকামনা করেছি, আজ সত্যি বাঁচতে ইচ্ছা হচ্ছে।···কিন্তু ভগবান বুঝি অত সুখ আমার অদৃষ্টে লেখেন নি। তোমার হাওয়া লেগে যেন গায়ে নূতন বল পাচ্ছি, আমায় বাঁচিয়ে তুল্‌তে পার না কি ?”

সৃষ্টি পাগলের মত বলিয়া উঠিল, “নিশ্চয় বাঁচ্‌বে, তোমায় বাঁচ্‌তে হবে। কোথাও তোমায় যেতে দেব না। বড় মূর্খ আমি তাই অন্তরের খোঁজ নিতে চেষ্টা করি নি, কি বিপথেই আমি চলেছিলাম, উঃ !”

সুরুচির মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মলিন হইয়া গেল, সে বলিল, “বাঁচি যদিও, তুমি তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন কর্ব্বে ? অপরাধ হবে যে।”

সৃষ্টি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, “অন্যায় আদেশ পালনের অন্ধ প্রবৃত্তি আমার আর নেই। অন্যায় আদেশ দানে যেমন অপরাধ—পালনেও তেমনি। তা ছাড়া, এ অপরাধের আমিও অংশীদার। আমার পদস্খলন হয়েছিল, বোধ হয় তোমারই পুণ্যের জোরে বেঁচেছি।”···

সুরুচি চক্ষু বুজিল, বিভিন্ন উত্তেজক চিন্তায় সে অবসন্ন হইয়া

পড়িয়াছিল। সৃষ্টি ধীরে ধীরে সুরুচির মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া আবেগ কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল,"প্রত্যেক মানুষের ভিতর ভগবান নিয়ত তাঁর সুর সাধনা করেন,—কোথাও তা বাৎসল্য-রূপে, কোথাও স্নেহরূপে, কোথাও প্রেমরূপে, কোথাও দাস্যরূপে ফুটে ওঠে। যতদিন না মানুষ তা বুঝ্‌তে শেখে ততদিন বাইরের সুরের হাওয়ার পেছনে পেছনে পাগল হয়ে ফেরে, কিন্তু শান্তি পায় না। দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যখন আঘাতে ও সংযমে নিস্তেজ হয়, প্রকৃত সুবের হাওয়ার কোমল স্পর্শ তখণ প্রাণে আপনি এসে পৌঁছে।··সোণার অগ্নি পরীক্ষার মত আমারো এ এক মহা পরীক্ষা গেছে সুরু, এইবার সেরে ওঠ।"···

খোলা জানালা দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস আসিতেছিল। শূন্যে একটা চাতক ডাকিয়া ডাকিয়া দূর-দূরান্তে উড়িয়া গেল।

সুরুচি উত্তর করিলনা, সজল মুখখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিল। সৃষ্টি বুঝিল। নীরবে নত হইয়া সুরুচির শীর্ণ ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্পর্শ করিল। চির আকাঙ্ক্ষিত মৃত-সঞ্জীবনীতুল্য স্বামীর সেই কোমল স্পর্শ সুরুচির শীর্ণ দেহখানি যেন অপূর্ব্ব শক্তি-পূত করিয়া দিল।·· সে বিশীর্ণ হস্তে স্বামীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমি এ স্বর্গছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইনা, আমি সেরে উঠ্‌ব।···বাইরের হাওয়ার কথা সবাই বলে ; কিন্তু অন্তরের সুরের-হাওয়ার খোঁজ ক'জন রাখে ? · এতদিন বৌদিকে লুকিয়ে ওষুধ ফেলে দিতাম,—আজ থেকে তোমার হাতে যেচে খাব।"···

সমাপ্ত

১২। সত্য ও মিথ্যা (৩য় সং)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
১৩। রূপের বালাই (৪র্থ সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। লাইকা (২য় সং)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী
১৭। বেগম সমরু (২য় সংস্করণ)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো
১৮। নকল পাঞ্জাবী (৫ম সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
২০। হালদার বাড়ী (২য় সং)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
২১। মধুপর্ক (২য় সং)—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
২২। চন্দ্রনাথ (১১ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৩। সুখের ঘর (৫ম সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী
২৬। ফুলের তোড়া—ইন্দিরা দেবী
২৭। অভাগী (দ্বিতীয় খণ্ড)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
২৮। বাঙালীর খাদ্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ
২৯। নব্য-বিজ্ঞান (২য় সং)—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীমতী সরলা দেবী
৩১। নীল মাণিক (২য় সং)—রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি-এ বাহাদুর
৩২। হিসাবনিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল
৩৩। মায়ের প্রসাদ (২য় সং)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৩৬। শয়তানের দান—(২য় সং)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৩৮। নিষ্কৃতি (৫ম সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী (৫ম সংস্করণ)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

৪০। কোন পথে (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ

৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার, এম এ

৪২। পল্লীরাণী (৩য় সং)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৪৩। ভবানী—৺নিত্যকৃষ্ণ বসু

৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪৫। অপরিচিতা (২য় সং)—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বসুমতী সম্পাদক

৪৭। দ্বিতীয়পক্ষ—(২য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল

৪৮। ছবি (৪র্থ সং)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৯। মনোরমা (২য় সং)—শ্রীমতী সরসীবালা বসু

৫০। সুরেশের শিক্ষা (২য় সং)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

৫১। নাচ্‌ওয়ালী (২য় সং)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

৫২। প্রেমের কথা (২য় সং)—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

৫৩। গৃহহারা—(২য় সং)—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৪। দেওয়ানজী (২য় সং)—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

৫৫। কাঙ্গালের ঠাকুর (৩য় সং)—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

৫৬। গৃহদেবী (২য় সং)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

৫৭। হৈমবতী—৺চন্দ্রশেখর কর

৫৮। বোঝাপড়া (২য় সং)—শ্রীনরেন্দ্র দেব

৫৯। বৈজ্ঞানিকের বিকৃত বুদ্ধি—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ রায়

৬০। হারান ধন—শ্রীনসীরাম দেবশর্ম্মা

৬১। গৃহ-কল্যাণী (২য় সং)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

৬২। সুরের হাওয়া (২য় সং) প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি এস সি

৬৩। প্রতিভা—শ্রীবরদাকান্ত সেনগুপ্ত

৬৪। আত্রেয়ী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, বি-এল

৬৫। লেডী ডাক্তার (২য় সং)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম এ

৬৬। পাখীর কথা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ

৬৭। চতুর্ব্বেদ (সচিত্র)—শ্রীভিক্ষু সুদর্শন

৬৮। মাতৃহীন—ইন্দিরা দেবী

৬৯। মহাশ্বেতা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৭০। উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান—শ্রীশরৎকুমারী দেবী

৭১। প্রতীক্ষা—শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল, বি-এ

৭২। জীবন-সঙ্গিনী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৭৩। দেশের ডাক—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৭৪। বাজীকর (২য় সং)—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

৭৫। স্বয়ম্বরা—শ্রীবিধুভূষণ বসু

৭৬। আকাশ কুসুম—শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ

৭৭। বরপণ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

৭৮। আহুতি—শ্রীমতী সরসীবালা বসু
৭৯। অন্ধা—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী
৮০। মণ্টুর মা—শ্রীচরণদাস ঘোষ
৮১। পুষ্পদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
৮২। রক্তের ঋণ (৩য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম-এ, ডি-এল
৮৩। ছোড়দি (২য় সং)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার
৮৪। কালো বৌ (২য় সংস্করণ)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি
৮৫। মোহিনী—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
৮৬। অকালকুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া
৮৭। দিল্লীশ্বরী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৮। সুরের মায়া—শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৯। আনন্দ-মন্দির (২য় সং)—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি এল
৯০। চিরকুমার—(২য় সং) অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ
৯১। নারীর প্রাণ—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-এ
৯২। পাথরের দাম—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি
৯৩। প্রজাপতির দৌত্য—শ্রীঅজয়কুমার সেন
৯৪। সাধে বাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৯৫। ঋণমুক্তি—অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় এম-এস্‌সি
৯৬। মুসাফির্ মঞ্জিল্—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর
৯৭। গ্রহের ফাঁদ—শ্রীমতী সরসীবালা বসু
৯৮। আয়ুষ্মতী—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
৯৯। গরীব—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার
১০০। বাজীওয়ালী—শ্রীসুষমা সিংহ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা